বেঙ্গল টাইমস

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

- ☐ সাহিত্য
- ☐ রাজনীতি
- ☐ বিনোদন
- ☐ খেলা
- ☐ ভ্রমণ

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলাপ ওই তিন মাসেই
❏ জগবন্ধু চ্যাটার্জি
আপনার জীবনে বাংলা কতটুকু!
❏ স্বরূপ গোস্বামী

রাজনীতি

স্পিকার মশাইয়ের দোষ নেই
❏ রক্তিম মিত্র
ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন
❏ স্বরূপ গোস্বামী
ইদ্রিশ আলির চিঠি কখনই জ্যোতি বসুর কাছে পৌঁছত না
❏ সরল বিশ্বাস

সাহিত্য

মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ
❏ ময়ূখ নস্কর
গোয়েন্দা কাহিনিও লিখেছিলেন আশাপূর্ণা
❏ শোভন চন্দ

ওপেন ফোরাম

কড়া বার্তা দেওয়ার সময় এসে গেছে
❏ জগবন্ধু চ্যাটার্জি
কিছু হলেই কৌশিক সেনের নামটা উঠে আসে কেন?
❏ ধীমান সাহা
এই অর্বাচীনদের কেন যে পাঠানো হয়!
❏ অজয় কুমার

গল্প

স্বপ্নমেদুর
❏ কুমকুম বসু দাস

বিনোদন

সিরিয়াল বন্ধ করুন, দেখবেন ঝগড়াও থেমে গেছে
❏ স্নেহা সেন

ভ্রমণ

নীল সাহেবের কুঠি
❏ শাশ্বত মজুমদার
চা–বাগানের মাঝ দিয়ে কমলার বাগানে
❏ স্বপ্নময় সেন

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

আ মরি বাংলা ভাষা

সে এক সময় ছিল। মাধ্যমিক শেষ মানেই যেন একঝলক টাটকা বাতাস। মনে হত, এতদিন যে যে কাজগুলো করে উঠতে পারিনি, এবার সেগুলো করে ফেলব। কেউ ভাবত বেড়াতে যাওয়ার কথা। কেউ ভাবত, সারাক্ষণ ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকার কথা। কেউ সেই সুযোগে সারাক্ষণ বসে থাকত টিভির সামনে। কেউ লাইব্রেরিতে নাম লিখিয়ে ফেলুদা–কাকাবাবুর সঙ্গী হয়ে যেত।

এই প্রজন্ম বোধ হয় সেই মুক্তির স্বাদ থেকে বঞ্চিত। এখন পরীক্ষার আগেই ইলেভেনের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে যেতে হয়। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে ছেলেরাও ছুটছে, বাবা–মাও ছুটছেন। সেই অনাবিল আনন্দটাই হারিয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতির সরণিতে হেঁটে গিয়ে যদি দিনগুলো ফিরে আসে, মন্দ কী!

এদিকে, একুশে ফেব্রুয়ারি। পয়লা বৈশাখের মতো এই দিনটায় বাঙালির হঠাৎ করে মনে পড়ে যায়, সে বাঙালি। আসলে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ঘিরে আমাদের অনুরাগ যেন বিশেষ একটা বা দুটো দিনের জন্যই তোলা থাকে। বছরের বাকি দিনগুলিতে যেন বাঙালি হওয়ার কোনও দায় নেই। বাকি দিনগুলিতে বাংলাকে উপেক্ষা করাই যেন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাংলা কতটুকু? আমরা কি সেই আত্মসমীক্ষা করেছি? তাই একুশে ফেব্রুয়ারি হোক আয়নার সামনে দাঁড়ানোর দিন। একটু একটু করে বাঙালি হয়ে ওঠার দিন।

ফিরে দেখা

গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলাপ ওই তিনমাসেই

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

ছোটবেলা থেকেই পড়তাম, ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস। যতবার পড়তাম, ততবারই মন খারাপ হত। আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? রোজ স্কুলে যেতে হয়, টিউশনি যেতে হয়, বেশিক্ষণ খেলাধূলা করা যায় না। সাঁতার কাটা যায় না। সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরতে হয়। যখনই টিভিতে খেলা দেখতাম, বাড়ির লোকজন বলত, সামনে পরীক্ষা, এখন টিভি দেখছিস? বড় হ, তারপর যতখুশি দেখবি।

এসব শুনতে শুনতেই বেড়ে ওঠা। যত দিন গেল, তত যেন চাপ বাড়তে লাগল। একটা টিউশনি থেকে দুটো হল। আরও নতুন নতুন সাবজেক্ট, মোটা মোটা বই। খেলার সময়, টিভি দেখার সময় যেন আরও কমে গেল। মনে হত, কবে মাধ্যমিকটা শেষ হবে। তারপর আমাকে পায় কে? নাইন থেকেই মনে হত, মাধ্যমিক শেষ হলে আমার স্বাধীনতা দিবস শুরু হবে। যেদিন মাধ্যমিক শেষ হবে, সেদিন হবে আমার স্বাধীনতা দিবস। পরীক্ষার সূচি ঘোষণা হল। লোকে জানতে চায়, পরীক্ষা কবে থেকে শুরু। আমি শুরুতেই জানতে চেয়েছিলাম, কবে শেষ। যতদূর মনে পড়ছে, শেষ দিনটা ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। আগের পরীক্ষাগুলো তেমন ভাল না হলেও অঙ্কটা বেশ ভালই হয়েছিল। ব্যাস, আমাকে আর পায় কে?

কিন্তু মুশকিলটা হল, ততদিনে প্রায় গরম পড়ে গেছে। ক্রিকেট খেলা বন্ধ। আমি খেলতে চাইলেই খেলব কার সঙ্গে। পাড়ায় অনেকের তখন সামনে উচ্চ মাধ্যমিক। কারও বা ক্লাস

সবুজ দ্বীপের রাজা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

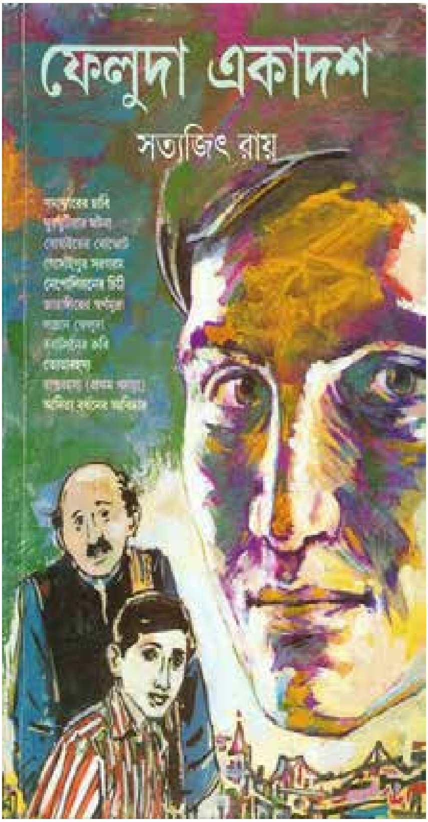

ইলেভেনের পরীক্ষা। কেউ আবার ক্লাস নাইন। তার বাড়ি থেকে ছাড়বে না। এদিকে, আমার পাড়ায় মাধ্যমিক দেওয়া বন্ধু তেমন নেই। কয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম মামার বাড়ি। নদীতে ঝাঁপ দেব, সে উপায় নেই। কারণ, তখন এক হাঁটুও জল নেই। পুকুর শুকিয়ে গেছে। বর্ষা আসতে তখনও ঢের দেরি। কী যে করি! বাড়ি ফিরে এসে লাইব্রেরি যাওয়া শুরু করলাম। মনে হল, এই সুযোগে গল্পের বইগুলো পড়ে ফেলা যাক। আগে গল্পের বই পড়লে সবাই খুব বকাবকি করত। এবার নিশ্চয় বকবে না। কিন্তু কী পড়ব? ওই সময় গোয়েন্দা গল্পের দিকে ঝোঁকটাই বেশি ছিল। কাকাবাবু, ফেলুদা আগেই কিছু পড়া ছিল। বাকিগুলোও পড়ে ফেললাম। এবার হাত দিলাম সার্লোকহোমসে। ইংরাজি নয়, বাংলায়। সেটাও নিমেশে শেষ। হাত দিলাম শেকসপীয়ারে। সেগুলোও এক এক করে শেষ। এক স্যার বললেন, সে কী, বাংলা বইগুলো কবে পড়বি? একজন বলল, রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করতে। একটা বই তুললাম। শেষ করতে পারিনি। ভাল লাগেনি। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা তুললাম। তাও মন ভরল না। বরং শরৎচন্দ্র ওই বয়সেই মনে কিছুটা দাগ কেটেছিল। আবার ফিরে এলাম সেই গোয়েন্দা গল্পে।

দেখতে দেখতে কখন যে তিন মাস পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। কোথাও যাওয়াও হল না। তবে ওই তিন মাস যা পড়েছিলাম, বাকি জীবনে এমন তিনমাস আর কখনও আসেনি। তাই একইসঙ্গে পড়ার বই থেকে মুক্তির তিন মাস। আবার গল্পের বইয়ে ডুবে যাওয়া তিন মাস। এভাবেই কেটেছিল আমার স্বাধীনতার দিনগুলো।

(বেঙ্গল টাইমসের ফিচার— মাধ্যমিকের পরে। কীভাবে কেটেছিল সেই তিনটে মাস। তা নিয়ে লিখতে পারেন আপনিও। পুরনো দিনগুলোকে একটু ফিরে দেখা। লেখা পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।
ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

অমর
একুশে
ফেব্রুয়ারী

আপনার জীবনে বাংলা কতটুকু?

স্বরূপ গোস্বামী

একুশে ফেব্রুয়ারি মানেই বাঙালির আদিখ্যেতার শেষ নেই। এমনই আদিখ্যেতা দেখা যায় পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ। যেন এই দুটো বা তিনটে দিন বাঙালি হলেই চলবে। বাকি দিনগুলোয় বাঙালি হওয়ার কোনও দায় নেই। এই একটা দিন ‘আ মরি বাংলা ভাষা’, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’— এমন কত বাংলা প্রেমের বন্যা বয়ে যায়।

এগুলো করুন। পয়লা বৈশাখে ধুতি পরুন। নববর্ষে বা জামাইষষ্ঠীতে ইলিশ খান। একুশে ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে' মেসেজ ফরোয়ার্ড করুন। কিন্তু নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করুন। আপনার দৈনন্দিন জীবনে

বাংলা কতটুকু? আপনার ছেলে বা নাতনি কোন মাধ্যমে পড়ে? নিশ্চয় বাংলা নয়। আপনার স্ত্রী বা বউমা হয়ত বলেন, ‘বাংলা আবার ভাষা নাকি’ ? আপনি নীরবে মেনে নিয়েছেন। কী জানি, আপনি নিজেও হয়ত মনে মনে এমনটাই বলছেন। মনে করে দেখুন তো, শেষ বাংলা বই কবে পড়েছেন? কয়েক মিনিট খবরের কাগজ উল্টে পাল্টে দেখা বা ফেসবুকে কয়েকটা পোস্ট পড়ে ভাবছেন আপনি দেশ উদ্ধার করে দিয়েছেন। কিন্তু টানা আধঘণ্টা পড়ার মতো ধৈর্য্য আপনার আছে তো? বইমেলায় তো যান। কটা বই কিনেছেন? যদি কিনেও থাকেন, কটা বই পড়েছেন? আচ্ছা, আপনি শেষ কবে বাংলায় কাউকে চিঠি লিখেছেন ? শেষ কবে চিঠি পেয়েছেন ? অবশ্য, না লিখলে পাওয়ার আশা না করাই ভাল।

আপনার বাড়ির আশেপাশে নিশ্চয় লাইব্রেরি আছে। একসময় হয়ত সেখানে নামও লিখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ কবে সেই লাইব্রেরিতে গিয়েছেন? এখন কার্ডটা রিনিউ করান তো ? সেখান থেকে শেষ কবে বই তুলেছেন? এবার আসা যাক গান শোনায়। অনেককেই দেখা যায়, কানে ইয়ারফোন গুঁজে রাস্তা পেরোচ্ছেন। যেন কতই ব্যস্ত। কতই না সঙ্গীতবোদ্ধা। সারা সপ্তাহে কটা বাংলা গান শোনেন? বাড়িতে সিডি বা ডিভিডি প্লেয়ার নিশ্চয় আছে। শেষ কবে সেখানে বাংলা গান চালিয়েছেন? মাসে কটা নাটক দেখেন? মানছি, দৈনন্দিন ব্যস্ততায় হয়ত নাটক দেখার সময় থাকে না। তাই বলে, বছরে দশটা নাটক দেখতে পারেন না? এতখানি ব্যস্ত আপনি নন। হতে পারে, আপনার আগ্রহ নেই। না থাকতেই পারে। বাংলা সিনেমা। হলে গিয়ে শেষ কবে দেখেছেন? এই বছরেই তো একগুচ্ছ ভাল বাংলা ছবি এল। কটা দেখেছেন? কটা দেখার ইচ্ছে হয়েছে ? স্মার্টফোনে এখন তো রোজ দেড় জিবি/দু জিবি ডেটা। মনের সুখে অনেককিছুই ডাউনলোড করছেন। সেই তালিকায় কটা বাংলা ছবি আছে? পুরনো ছবিগুলো ডাউনলোড করতে ইচ্ছে হয় না?

বাংলা কম্পোজ করতে পারেন? হোয়াটসঅ্যাপে এখনও ইংরাজি হরফে লিখতে হয় কেন? বাংলা হরফে লেখা কিন্তু খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। চাইলেই অভ্যেস করা যায়। কজন এভাবে বাংলা লেখার বা শেখার চেষ্টা করেছি? ফেসবুকে দু চার লাইনের পোস্ট দিয়েই দায় শেষ। যেই দশ লাইন লিখতে বলা হল, তখনই কঙ্কাল বেরিয়ে পড়বে।

বাঙালি যদি হতে হয়, তাহলে একদিন বা দুদিনের আদিখ্যেতা নয়। রোজ বাঙালি হয়ে উঠুন। বাংলাকে ভালবাসুন। বাংলা বই পড়ুন, গান শুনুন, ছবি দেখুন। বাংলা লিখতেও শিখুন। নইলে একুশে ফেব্রুয়ারিটা বড্ড বেমানান মনে হবে।

ওপেন ফোরাম

কড়া বার্তাটা দেওয়ার সময় এসে গেছে

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

বাঙালি যেন নিজভূমে পরবাসী। নিজের রাজ্য। সেখানে সে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে না। জেলার দিকে, গ্রামের দিকে যদিও বাংলা বেঁচে আছে, শহর কলকাতা থেকে বাংলা একেবারেই যেন নির্বাসিত। শুধু ইংলিশ মিডিয়ামকে দোষারোপ করে লাভ নেই।রাস্তায়, দোকানে, ট্যাক্সিতে কতটুকু বাংলা শুনতে পাই? সবাই এখানে হিন্দিতে কথা বলতেই অভ্যস্থ। এমনকী বাঙালিরাও সেই স্রোতেই গা ভাসিয়েছে। বাংলা না বলাটাই যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন আপনার মোবাইলে বিভিন্ন কোম্পানির ফোন আসে। বেশিরভাগই হিন্দিতে। এমন নয় যে তাঁরা দিল্লি বা মুম্বই থেকে করছেন। এই কলকাতার অফিস থেকেই ফোন আসছে। কিন্তু টেলিকলার বাংলা জানে না। বা জানলেও বলবে না।

ট্যাক্সিতে উঠুন। এখানে তো আরও ভয়ঙ্কর। বাঙালি ড্রাইভার কমতে কমতে প্রান্তিক হয়ে এসেছে। যদিও বা কয়েকজন আছেন, তাঁরাও শুরুই করেন হিন্দি দিয়ে। উত্তর কলকাতায় তবু কিছুটা বাংলা পাবেন। দক্ষিণ কলকাতার বিশেষ কিছু জায়গায় হয়ত পাবেন। বাকি অংশে বাংলা কোথায়? অধিকাংশ দোকানেই আপনাকে হিন্দি শোনার জন্য তৈরি থাকতে হবে। অবাঙালিদের আমরা বাংলা শেখানোর তাগিদই অনুভব করিনি। এই তালিকায় মুসলিমরা যেমন আছেন, তেমনি মারওয়াড়ি, গুজরাটি, বিহারীরাও আছেন। পার্ক সার্কাস, তপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, রাজাবাজারে আপনি বাংলা শুনতে পাবেন না। ঠিক তেমনি বড়বাজারে গেলেও পাবেন না। মনে হবে, দোষটা তাদের নয়, আপনার। কারণ আপনি বাংলা জানেন। আপনাকেই তাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে হবে।

যাঁরা কয়েকমাসের জন্য এসেছেন, তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু যাঁরা বহু বছর ধরে এখানে আছেন, যাঁদের এখানেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাঁরাও বাংলায় কথা বলেন না। বরং আমরা আদিখ্যেতা করে তাঁদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলি। অনেক হয়েছে। এবার এটা বন্ধ হওয়া দরকার। একটা কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার।

মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ

ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। অমরত্ব পাওয়া এই লাইনগুলি লিখেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মদিন। শতবর্ষ পেরিয়ে আসা পদাতিক কবি। একুশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্ত তুলে ধরলেন **ময়ূখ নস্কর**।

পত্রিকা অনেক রকমের হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক। কিন্তু এসবের বাইরেও কিছু পত্রিকা থাকে, যাঁদের বলা হয় ঐকিক পত্রিকা। এই ধরনের পত্রিকার একটিই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রচুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংখ্যাটি কিছুতেই পৃথিবীর মুখ দেখে না। সে অর্থে এই পত্রিকাগুলিকে অদ্বিতীয় বলতে পারেন।

২০০১ সালে আমি এমনই একটি ঐকিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলাম। পত্রিকা কেমন হয়েছিল তা নাই বা শুনলেন। একটা তথ্য শুনে যা বোঝার বুঝে নিন, পত্রিকার আরও দুজন সম্পাদক ছিল, তারা আমারই বন্ধু। কিন্তু লোকের সামনে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না বলেই তাদের নাম উল্লেখ করছি না। আমার এই দ্বিধা দেখেই বুঝে নিন পত্রিকাটি কেমন হয়েছিল। আমিও নিজের বউ ছাড়া কারোর কাছে সেই পত্রিকা নিয়ে বাহাদুরি ফলাই না। আপনাদের কাছেও ফলাচ্ছি না। তবুও কথাগুলো বলতেই হল, কারণ আসলে যে কথাটা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে পত্রিকাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কলকাতা ইউনিভার্সিটির রাখালদা তখনও বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে ছিলেন। তাঁর ক্যান্টিনে বসে বসেই সম্পাদনার কাজকর্ম হত। একদিন সবার মনে হল, এই পত্রিকা তো একদিন সাহিত্য জগতে মহীরুহ হয়ে উঠবে, তাই প্রথম থেকেই সাহিত্য জগতের মহীরুহদের লেখা এতে ছাপানো যাক। লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে অবশ্য মন্দাক্রান্তা আর শ্রীজাতর (দুজনেই তখনও নেহাতই নবাগত) বেশি এগোতে পারিনি, কিন্তু সাক্ষাৎকার পেয়েছিলাম··· সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। আর পদাধিকারের জোরে সুবিধাবাদের চরম নিদর্শন রেখে, সেই সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম আমি। সেই অভিজ্ঞতার বিবরণই আপনাদের শোনাতে বসেছি।

বন্ধুদের কাছে খুব বাহাদুরি করে বলেছিলাম, ‘আমার ঠাকুরদা হারানচন্দ্র নস্করের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল। তাঁর ডাকবাংলার ডায়রি বইতে ঠাকুরদার উল্লেখ আছে।’ কিন্তু মনে মনে জানি, বজবজ জুটমিলের দিনগুলো কোন সত্যযুগে কালের গর্ভে মিলিয়ে গেছে। ঠাকুরদা মারা গিয়ে বোধহয় মার্কসলোকে গমন করেছে। কবির বয়েসও নয় নয় করে ৮০ পেরিয়েছে। কোথাকার কে হারানদা, তা মনে আছে কি না কে জানে? তাই যাবার আগে ঠ্যাং দুটো কাঁপতে লাগল। আমি, আমার বন্ধু স্বরূপ গোস্বামী (যে বেঙ্গলটাইমসে এই লেখাটি পড়ছেন, তার সম্পাদক) এবং আরেক বন্ধু সুস্মিত সরকারকে বললাম, যাবি?

কলেজ স্ট্রিটের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে শরৎ মুখার্জি রোডে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, স্বরূপ বলল, ‘এটা কি কবির বাড়ি বলে মনে হচ্ছে?’ কড়া নাড়তে এক কিশোরী এসে দরজা খুলে দিল। বোধহয় কবির নাতনি। পরিচয় দিতে মেয়েটি বলল, ‘একটু বসুন।’ স্বরূপ আবার ফিসফিস করে বলল, ‘এই মেয়েটির মধ্যে কি একজন সাম্যবাদী কবির নাতনি হবার কোনও লক্ষণ আছে?’

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল লুঙ্গি পরা এক বৃদ্ধ সোফার উপরে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। মুখ দেওয়ালের দিকে। কিন্তু মাথাভর্তি কাশ ফুলের মতো চুল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি কে। মেয়েটি বলল, ‘দাদু ও দাদু…’ বলে আমাদের আগমন বার্তা জানাল। বৃদ্ধ ছেলেমানুষের মতো

আর্তনাদ করে বললেন, 'আঁ আঁ আমি এখন কথা বলব না।' বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

অগত্যা ফিরে আসতে হল, পরদিন সকালে আসার আশ্বাস নিয়ে। ফিরে আসার সময় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এক রোমাঞ্চকর কাণ্ড হয়েছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক। বরং সেই রাতে বাড়ি ফিরে কী রোমাঞ্চকর কাণ্ড করেছিলাম তাই বলি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুজপ্রতিম এক কবি লিখেছিলেন, ''আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ, স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।'' ঠিকই লিখেছিলেন। কিন্তু স্পর্ধারও তো একটা সীমা পরিসীমা থাকে! তখন আমরা একুশ পেরিয়ে বাইশের দিকে। আজ ভাবলে হতবাক হই, কোন স্পর্ধায় সুভাষ মুখোপাধায়য়কে নিয়ে একটা আস্ত কবিতা লিখেছিলাম, তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য? কবিতার কথায় পরে আসব, আগে কবি-সাক্ষাতের কথা সেরে নিই।

পরদিন সকালে স্বরূপের সময় হল না। আমি আর সুস্মিতই গেলাম। কবি তাঁর বারান্দার চেয়ারে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে বসে আছেন। কানে গোঁজা একটি বিড়ি। ঘরের ভিতরে কী কী ছিল মনে নেই, এটুকু মনে পড়ছে, বিভিন্ন পশু পাখির ছবি ও নাম লেখা একটা চার্ট, যা স্কুলের বাচ্চাদের কাজে লাগে, টাঙানো ছিল। কেন কে জানে? গতকালের সেই কিশোরী এসে বলল, 'দাদু কানে শুনতে পায় না। যা বলার আছে, লিখে দেবেন।' সে কি? তা হলে গতকাল নাতনির কথা বুঝল কী করে? বুড়ো কি লিপ রিডিং জানে ? সুস্মিত বলল, 'ওরে বুড়ো বুড়ো বলিস না। সেটাও হয়তো লিপ রিডিং দেখে বুঝে নেবে।'

যাই হোক। কাগজে লিখলাম, 'আমি বজবজের বুড়ো হারানদার নাতি।' তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা।' বললেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম, সৌজন্যের খাতিরে বলা। অতদিনের কথা কারও মনে থাকে? এবং আমি ভুল বুঝেছিলাম। নিজেই শুরু করলেন হারানদার কথা। আমার এক পিসি, আমার জন্মের ঢের আগে মারা গেছিল। তাঁর কথাও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে আছে।

কথা বলতে বলতে মনে একটু বল ভরসা পেলাম। গতকাল রাতের স্পর্ধাটা আবার একটু একটু করে ফিরে এল। তারপর করে ফেললাম সেই দুঃসাহসিক কাজ। কথায় বলে, দেবদূতরা যে কাজ করতে ভয় পায়, মূর্খরা সেই কাজ অনায়াসে করে ফেলে। আমি মূর্খ নিঃসন্দেহে, নইলে তাঁর হাতে স্বরচিত কবিতা তুলে দিতে পারি? কবিতাটা শুনবেন ? না থাক! লোক হাসিয়ে লাভ নেই। সান্ত্বনা একটাই, তিনি তরুসম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে কবিতাটা 'ভালো হয়েছে' বলেছিলেন।

সেটা যে কতবড় মিথ্যা কথা ছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি। আর ভাবি, কি ভাগ্যিস, এই কবিতা পড়ার পরেও তিনি বেশ কয়েক বছর বেঁচেছিলেন। তবুও, যতই মিথ্যা হোক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভালো বলেছিলেন, এটা কি জীবনের কম বড় প্রাপ্তি! আপনারাই বলুন না।

গোয়েন্দা-কাহিনিও লিখেছিলেন আশাপূর্ণা!

শোভন চন্দ

আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই তাঁর বেড়ে ওঠা। তবে সময় যেন তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে, করে তুলেছে অনন্যা। একটু মজা করে বলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের রান্না ঘরে ইনি পাকা রাঁধুনি, পরম যত্নে-স্নেহে একের পর এক উপহার আমাদের দিয়ে গেছেন। তৎকালীন সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করে সাহিত্যকে দিয়েছেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে তাঁর লেখনীগুণে করেছেন সমৃদ্ধ। তবে কেমন ছিলেন গৃহিনী আশাপূর্ণা, কেমন ছিলেন সবার প্রিয় মাসিমা আশাপূর্ণা দেবী, সেই অজানা -অদেখা স্মৃতিচারণে নানা মজার কথা তুলে ধরলেন আমাদের সকলের প্রিয় ভানুবাবু (সবীতেন্দ্রনাথ রায়)।

আশাপূর্ণা দেবীর সান্নিধ্যে যখন প্রথম যাই তখন আমি নিতান্তই তরুণ, সবে প্রকাশনার কাজে ঢুকেছি। সে সময়ে তাঁর উপন্যাস ‘বলয়গ্রাস’ ছাপা হচ্ছে। এটি কোনও পত্র-পত্রিকায় বেরোয়নি। আশাপূর্ণা দেবী সরাসরি পাণ্ডুলিপি লিখে দিচ্ছিলেন কিস্তিতে- কিস্তিতে। আমি আনতে গেলাম সম্ভবত তৃতীয় কিস্তি। আমরা দরজায় যেতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে আমাদের বসাল, আমরা বসবার পর মেয়েটি জলখাবার দিয়ে গেল। বলল একটু বসুন, মা ঠাকুমাকে খাইয়ে আসছেন।

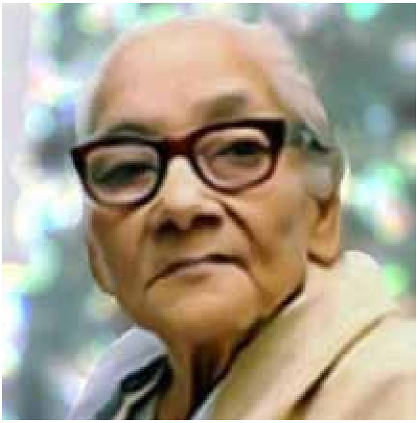

কিছুক্ষণ বাদে আশাপূর্ণা দেবী এলেন। হাতে সুন্দর লাইন টানা পাণ্ডুলিপি। সত্যি বলতে আশাপূর্ণা দেবীর সাথে এক মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্ত একরকম আমাদের মাসিমা মেসোমশাই ছিলেন, আশাপূর্ণা দেবীর বাড়ি ছিল প্রথমে দর্জিপাড়ায়, উত্তর কলকাতায়। একান্নবর্তী পরিবার সেকালের কট্টর রক্ষণশীলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন আশাপূর্ণারা। ঠাকুমা ছিলেন কর্ত্রী। তাঁর কড়া হুকুম- বাড়ির মেয়েরা গৃহকর্ম শিখবে শুধু, লেখাপড়ার ধারেকাছে যাবে না। দাদারা পড়তেন গৃহশিক্ষকের কাছে। দাদারা তখন সদ্য স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখতে শিখেছেন। আশাপূর্ণা উল্টো দিকে বসে থাকতেন দাদাদের পড়াশুনো লক্ষ্য করতেন। তাই দেখে আশাপূর্ণা শেখেন লিখতে, কিন্তু সব

উল্টোভাবে, যেহেতু উল্টোদিকে বসে লিখতেন। মেয়ের লেখাপড়ার উৎসাহ দেখে মা রাতে শোওয়ার সময়ে আয়নায় উল্টো লেখা দেখিয়ে কীভাবে সোজা লিখতে হয় তা শেখালেন। শুরু হল মায়ের কাছে বই পড়া ও লেখার প্রথম পাঠ। বাবা হরেন্দ্রকুমার ছিলেন শিল্পী। মা –বাবার শিল্পী মানসিকতার প্রভাবে এইভাবে আশাপূর্ণা সাহিত্যপাঠের জগতে প্রবেশ করলেন। সত্যি বলতে, এক চরম দুঃসাহসে কবিতা লিখে ফেললেন আশাপূর্ণা, নাম দিলেন – ‘বাইরের ডাক’। কিছুদিন পরে কবিতাটি শিশুসাথী পত্রিকাতে প্রকাশিত হল।

তখনকার প্রথামতো আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সেই , বছর পনেরো তখন তিনি। শ্বশুরবাড়ি সেকালের রক্ষণশীল পরিবার।
তখনকার রক্ষণশীল পরিবারে, সমাজে কোন মহিলা লিখছেন এবং সেই লেখা পত্র- পত্রিকায় বেরোচ্ছে কেউ ভাবতে পারত না। কালিদাসবাবু নিজেই ব্যবস্থা করে দেন, যাতে পত্নী রাত্রে হ্যারিকেনের আলোয় লিখতে পারেন। কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে লন্ঠন, যাতে আলো বাইরে না যায়। লেখা হলে নিজেই পৌঁছে দিতেন পত্র- পত্রিকাতে।

একদিন আশাপূর্ণা দেবী রাতে আমায় ফোন করলেন, ভানু , তোমার মেশোমসাই ও আমি কাল দুপুর বারোটার ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাব। তুমি কষ্ট করে দুটো বই –একটা “বলয়গ্রাস” আর একটা “নির্জন পৃথিবী” কৃষ্ণনগরের ট্রেনে পৌঁছে দেবে । তাহলে আমার শ্বশুর বাড়িতে মুখ রক্ষে হয়। আমরা ১২ টার ট্রেনে যাব।

সেই মত পৌঁছে দিয়ে বললাম, মাসিমা এবার তাহলে ধারাবাহিকটা শুরু করা যাক মাসিমা হেসে বললেন সামনের মাস থেকে দেব ,প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি । আমি বললাম তাহলে নামটা দিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন করতে হবে তো। উনি বললেন ওই প্রতিশ্রুতি দাও না না বরং “প্রথম প্রতিশ্রুতি” দাও । সেই “প্রথম প্রতিশ্রুতি” উপন্যাসের ভিত্তিস্থাপন । ১৩৬৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে প্রথম প্রতিশ্রুতি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে ।

জন্মদিনে রাধাবল্লভী, দরবেশ চমচমের সঙ্গে আশাপূর্না দেবীর নিজের হাতে ভাজা বেগুনী অন্যতম চিত্তাকর্ষক খাবার ছিল। বড় সুখের দিন ছিল। “প্রথম প্রতিশ্রুতি” উপন্যাস “রবীন্দ্র- পুরস্কার” পেল । ১৯৭৭ সালে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেল। সংসারে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ হয় না, জ্ঞানপীঠ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল কালিদাস বাবুর কঠিন ব্যাধি – ক্যান্সার। তার বয়স ও স্বাস্থ্য বন্ধু প্রিয়জনদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল, পুরস্কার হাতে নেওয়ার সময় কালিদাস বাবু সুস্থ থাকবেন তো? আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে যেতে পারবেন তো ? বন্ধু বান্ধবরা ঠিক করলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদানের আগেই কলকাতায় মহাবোধি সোস্যাইটি হলে আশাপূর্ণা দেবীকে এই উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যমোদীদের আন্তরিকতায় সে সংবর্ধনা সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

কালিদাসবাবু চলে যান ১৯৭৮ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ। আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নিতে যাওয়ার আগেই কালিদাস বিদায় নেন। অবশ্য কালিদাস বাবু বিয়ের দিন থেকেই আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তি স্বত্বা সাহিত্যিক স্বত্বা উভয়কেই আগলে রাখতেন। “দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে” উপন্যাসে এই পত্নিকে আগলে রাখার একটি আভাস পাওয়া যায় । প্রায় সুস্থ থাকার শেষ দিন পর্যন্ত আশাপূর্ণা কলম চালনা করেছেন তারপর কলম চালনা আর অন্ন গ্রহণ এক সঙ্গে থেমেছে । ১৯৯৫ খ্রীঃ ১৩ ই জুলাই তিনি পরপারে যাত্রা করেছেন, তবে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজও থেকে গেছে…

ইদ্রিশ আলির চিঠি কখনই জ্যোতি বসুর কাছে পৌঁছত না

কিছুটা নিঃশব্দেই চলে গেলেন ইদ্রিশ আলি। পোশাকি পরিচয় তৃণমূলের বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ। পেশায় আইনজীবী। বরাবরই বেশ বিতর্কিত। অবশ্য, কিছু বিতর্ক ইচ্ছে করেই ডেকে আনতেন। স্রেফ খবরে থাকার জন্য। খবরে থাকার একটি অভিনব পন্থা ছিল। তাঁর স্মরণে সেদিকেই আলো ফেললেন সরল বিশ্বাস।

সময়টা সেই নয়ের দশক। তখনও বাঙালির জীবনে টিভি বলতে সবেধন নীলমণি দূরদর্শন। আর খবর বলতে, সন্ধে সাড়ে সাতটা আর রাত দশটা কুড়ির বাংলা সংবাদ। রেডিও-তে অবশ্য স্থানীয় সংবাদ ছিল। তখনও কাগজে একলাইন খবর মানে, দারুণ একটা ব্যাপার।

টিভির খবরে প্রায়ই একটা নাম শোনা যেত, ইদ্রিশ আলি। তখন তিনি ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক। একে প্রদেশ কংগ্রেস। তার আবার সংখ্যালঘু সেল। তার আবার সাধারণ সম্পাদক। অনেকটা পালংশাকের ক্যাশমেমোর মতোই। কিন্তু তিনি নিয়মিত প্রচারের আলোতেই থাকতেন।

আসলে, রোজই কোনও না কোনও একটা বাহানায় তিনি চিঠি লিখতেন। যাকে তাকে নয়, একেবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। বিচিত্র সব বিষয়। কোনওদিন হয়তো ঈদের শুভেচ্ছা জানাতেন। কোনও দিন ইরাকে বোম পড়লে শোক জানাতেন। কোনওদিন মধ্যপ্রদেশে ট্রেন দুর্ঘটনা হলে তদন্ত চাইতেন। কোনওদিন কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর মধ্যে নদীর জলবন্টন সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইতেন।

আচ্ছা, ইরাকে বোম পড়লে জ্যোতি বসু কী করবেন? মধ্যপ্রদেশে ট্রেন দুর্ঘটনা হলেই বা

জ্যোতি বসুর কী করার আছে? কিন্তু ইদ্রিশ আলিকে সেটা কে বোঝায়? তাঁকে নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতেই হবে। যাকে তাকে চিঠি লিখলে খবর হবে না, অতএব মুখ্যমন্ত্রী। সব বিষয়েই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করতেন।

জ্যোতি বাবু সময় পেলে রাতে দূরদর্শনের বাংলা খবর শুনতেন। কখনও কখনও রেডিওর স্থানীয় সংবাদও শুনতেন। সকালে কাগজেও চোখ বোলাতেন। প্রায়ই দেখতেন, তাঁকে কোনও এক ইদ্রিশ আলি নাকি চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সেই চিঠি কোনওদিনই হাতে আসত না। লোকটা আসলে কে? তাঁর মনেও কৌতূহল তৈরি হল।

একদিন প্রদেশ কংগ্রেসের একটা প্রতিনিধি দল জ্যোতি বসুর কাছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ডেপুটেশন দিতে গেল। সেই দলে সম্ভবত ছিলেন সোমেন মিত্র, অতীশ সিনহা, মানস ভুঁইয়া, আব্দুল মান্নানেরা। হঠাৎ, জ্যোতি বাবু জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কে একজন নেতা আছেন, রোজ আমাকে নাকি চিঠি লেখেন। কই, আমি তো কোনও চিঠি পাই না।'

সোমেনবাবুরা তখন এর-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। জ্যোতি বাবু কার কথা বলছেন, অনেকে বুঝতেও পারছেন না। তখন কোনও একজন বললেন, 'আপনি কি ইদ্রিশ আলির কথা বলছেন?' জ্যোতিবাবুর হঠাৎ করে নামটা মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই কী একটা আলি। টিভিতে শুনি আমাকে চিঠি লিখেছেন। কাগজেও দেখি, চিঠি লিখেছেন। আমি খোঁজ নিয়েও দেখেছি। কই, কোনও চিঠি তো আসেনি। ওঁকে একবার নিয়ে আসবেন তো।'

আসলে, ইদ্রিশ আলি প্রথম হয়তো চিঠি পাঠাতেন। কিন্তু তা জ্যোতি বসুর টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতো না। পৌঁছনোর কথাও নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় তো এমন প্রচুর চিঠি আসে। সব চিঠি তো আর তাঁর টেবিলে যায় না। সচিবালয়েরই কেউ হয়তো দেখতেন। বাছাই করা কিছু চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে দেখাতেন। বাকিগুলো ফেলে দিতেন। তাঁর হয়তো মনে হত, এসব উল্টো পাল্টা চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার মানেই হয় না।

এদিকে, ইদ্রিশ আলির তো মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। তিনি জানেন, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে খবর হবে, তাই লেখেন। তারপর সেগুলো জেরক্স করিয়ে পরিচিত সাংবাদিকদের বিলি করতেন। তাতেই খবর হয়ে যেত। খবর যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন আর মুখ্যমন্ত্রীকে পোস্ট করার দরকার কী! মাঝে মাঝে সাংবাদিকদের বিরিয়ানি খাওয়ালেই হল। এটা-ওটা উপঢৌকন দিলেই হল। পরের দিকে হয়তো চিঠি লিখতে পারতেন না। পরিচিত সাংবাদিকদের ফোন করেই বলতেন, 'আজ মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে চিঠি লিখলাম। একটু দু-লাইন খবর করে দিও ভাই।' সেই খবরও হয়ে যেত। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি এলই না। কিন্তু খবর হয়ে গেল। পরের দিকে, চিঠি লেখাও হল না, কিন্তু চিঠি লিখেছেন, খবর হয়ে গেল।

হ্যাঁ, এভাবেই খবরে ভেসে থাকতেন ইদ্রিশ আলি। খবরে থাকতে কত চিঠি যে লিখেছেন। ঠিকঠাক জমিয়ে রাখতে পারলে হয়তো গিনেস বুকে নামও উঠে যেত। আজ যখন চিঠি লেখা একরকম হারিয়েই গেছে, তখন ইদ্রিশ আলির মতো কেউ তো ছিলেন, যিনি খবরে থাকতে চিঠিতেই ভরসা রেখেছিলেন।

ওপেন ফোরাম

কিছু হলেই কৌশিক সেন নামটা উঠে আসে কেন?

ধীমান সাহা

কোনও একটা অপকর্ম হলেই হল। কেউ কেউ অমনি প্রশ্ন তুলে দেন, বুদ্ধিজীবীরা কোথায় গেলেন? কারও কারও একেবারে স্পেসিফিক প্রশ্ন, কোথায় গেলেন অপর্ণা সেন, কৌশিক সেনরা?

বারবার এই দুটো নাম কেন যে উঠে আসে, বুঝি না। এই বাংলায় সরকারে দাক্ষিণ্যভোগী, নির্লজ্জ তোষামোদকারী বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। চাইলে, এমন পঁচিশ–তিরিশটা নাম করাই যায়। কিন্তু কেন বারবার অপর্ণা সেন আর কৌশিক সেনের নামটা ভেসে ওঠে? যাঁরা এই দু’জনের নাম টেনে আনেন, তাঁরা সচেতনভাবেই আনেন? নাকি এই দুটো নামই প্রথমে মনে পড়ে যায়!

হ্যাঁ, সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম পর্বে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ ছিলেন কৌশিক সেন। বিভিন্ন সভাসমিতিতে, টিভির বিতর্কসভায় তাঁরা বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এমনকী পরিবর্তন চাই বলে আওয়াজও তুলেছিলেন।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর অনেকেই বিধায়ক, সাংসদ হয়ে গেলেন। অনেকেই

Peace PROT
USTAKH-E-RA

অনেক কমিটির মাথা হয়ে বসে গেলেন। দলীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ আলো করলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বরাত পেলেন। সেই তালিকায় কি আদৌ রাখা যায় অপর্ণা সেন বা কৌশিক সেনকে? মনে করে দেখুন তো, তৃণমূলের কোন মঞ্চে তাঁদের দেখেছেন? মনে করে দেখুন তো, তাঁদের কোন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে? মনে করে দেখুন তো, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দলীয় মঞ্চে দন্ত বিগলিত করে তাঁরা কোনওদিন ছবি তুলেছেন কিনা। মনে করে দেখুন তো, তৃণমূলের বা শাসকের কোন অন্যায়টাকে জাস্টিফাই করার জন্য তাঁরা মিছিলে হেঁটেছেন?

বরং উল্টোটা বারবার হয়েছে। কৌশিক সেনকে বছরের পর বছর অ্যাকাডেমি দেওয়া হয়নি। শনি–রবিবার কোনও নাটকের শো দেওয়া হয়নি। শাসক নিয়ন্ত্রিত বা শাসকদল নিয়ন্ত্রিত কোনও কল শো–তে তাঁদের ডাকা হয়নি। বাধ্য হয়ে অ্যাকাডেমি ছেড়ে অন্য মঞ্চ খুঁজে নিতে হয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি অপকর্মেই সোচ্চার হয়েছেন। সাধ্যমতো প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তায় নেমেছেন। চিভির বিতর্কে বা প্রতিক্রিয়ায় দ্ব্যর্থহীনভাষায় তিরষ্কার করেছেন।

কিন্তু তারপরেও আক্রমণ থেমে নেই। কিছু হলেই তাঁদের কাঠগড়ায় তোলা হয়। ‘চটি চাটা’, ‘তৃণমূলের দালাল’ এইসব আখ্যানে ভূষিত করা হয়। কোনও প্রতিবাদ মঞ্চে গেলে প্রশ্ন তোলা হয়, এতদিন পর মনে পড়ল! তারপর যা যা বিশেষণ ভেসে আসার, তাই আসে। প্রতিবাদী চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে গেলে ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হয়। সন্দেশখালির নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গেলেও তাঁদের দিকেই আক্রমণ ধেয়ে আসে।

দিনদিন এই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর সত্যিই আস্থা হারিয়ে ফেলছি। হ্যাঁ, এই মিডিয়ার শক্তি অপরিসীম। এই মিডিয়ায় অনেক মানুষ গর্জে ওঠেন। মূলস্রোত মিডিয়ায় আড়ালে থাকা অনেক বিষয় উঠে আসে। কিন্তু পাশাপাশি এর অসহিষ্ণুতার দিকটাও মারাত্মক। অনেক সময় যেন ইতরতার উদযাপন চলে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, আক্রমণ করা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক যুক্তি–বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে চলে লাগাতার আক্রমণ। ভাবতে অবাক লাগে প্রায় এক দশক ধরে সরকারের চাটুকারি করে, মাসে লাধিক ভাতা নিয়ে এখন বিজেপির লেজ ধরা রুদ্রনীল ঘোষও কিনা এঁদের নামে সমালোচনা করেন। কোথায় গেল বুদ্ধিজীবীরা বলে আওয়াজ তোলেন। আর সেসব পোস্টে লাইক পড়ে!

হ্যাঁ, এটা ঘটনা, কৌশিক সেন বা অপর্ণা সেনরা যতটা তৃণমূল বিরোধী, তার থেকে অনেক বেশি বিজেপি বিরোধী। তাই আগামীদিনে যদি বিজেপি ক্ষমতায় এসেও যায়, এখন তৃণমূলের ছাতার তলায় থাকা অনেকেই হয়তো গেরুয়া চাদরে গা ঢাকবেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সেই তালিকায় থাকবেন না কৌশিক সেনরা। তাই হয়তো এত এত লোক থাকতে বেছে নেওয়া হয় কৌশিক সেনকে। যে কৌশিক সেন গত বারো–তেরো বছরে তাঁর মতো করে লড়ে চলেছেন। যে কৌশিক সেন শাসকের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেননি। যে কৌশিক সেন শাসকের দাক্ষিণ্যের পরোয়া করেননি। যে কৌশিক সেন পেশাগত এত ক্ষতিস্বীকার করেও তাঁর মতো করে প্রতিবাদ করে চলেছেন। সেই প্রতিবাদ সম্মান জানানো তো দূরে থাক, প্রতিনিয়ত ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। কিছু লোক আছেন, গালাগাল দেওয়াটাই যাঁদের কাজ। কিন্তু বাকিরা না বুঝেই তাতে সামিল হয়ে যাচ্ছেন। তখন সেই গালাগালটাই মূলস্রোত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু অবাক লাগে যখন বাম সমর্থকেরাও সেই কোরাসে গলা মেলান। কিছু হলেই কৌশিক সেনের নামটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন। যেন যত প্রতিবাদের ঠিকে কৌশিক সেন নিয়ে রেখেছেন। নিজেরা চাকরি করার পরেও বাড়ির লোকেদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের লাইনে দাঁড় করাবেন। পাড়ার তৃণমূল নেতাদের দেখে দন্ত বিগলিত করে হাত কচলাবেন। আর যত প্রতিবাদের দায়িত্ব কৌশিক সেনদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। সোশাল মিডিয়ায় দু লাইন পোস্ট দিয়ে বিপ্লব করবেন। বাম শিবিরে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। এই লোকেরা কি দলের সম্পদ হতে পারেন! এই লোকেরা কি শাসকের হাতকেই আরও শক্তিশালী করছেন না? এটাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

স্পিকার মশাইয়ের দোষ নেই

রক্তিম মিত্র

মাঝে মাঝেই শোনা যায়, স্পিকারের পদটা সাংবিধানিক পদ। সম্মানীয় পদ। তাই স্পিকার সম্পর্কে সমালোচনা করা যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করা যাবে। রাজ্যপালের নামে যা খুশি বলা যাবে। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিরও সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু স্পিকার নিয়ে নাকি কিছু বলা যাবে না। টিভির সান্ধ্য বিতর্কে মাঝে মাঝেই এমনটা শোনা যায়। স্পিকার নিয়ে কেউ কিছু বলতে গেলে সঞ্চালকও থামিয়ে দেন।

আগে মনে হত, স্পিকার নিয়ে সমালোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওই পদটাকে অন্তত বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখাই উচিত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, সেই ধারণাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সবার সমালোচনা হলে স্পিকারই বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকবেন কেন? বিশেষ করে তিনি যদি লাগাতার এমন আজগুবি সব কাণ্ড করে যান।

মানছি, ওই চেয়ারটা খুব সম্মানের। কিন্তু যিনি ওই চেয়ারে বসছেন, সম্মানরক্ষার দায়িত্ব তো তাঁরও। শুধু বাইরের লোকেরা সেই চেয়ারকে সম্মান দেখিয়ে যাবেন, আর যিনি চেয়ারে বসছেন, তিনি বছরের পর বছর ওই চেয়ারকে কলঙ্কিত করে যাবেন, একের পর এক ন্যক্কারজনক আচরণ করে যাবেন, এটা তো হতে পারে না। যিনি ওই চেয়ারে বসছেন, তিনি যদি নিজের চেয়ারকে সম্মান দিতে না শেখেন, লোকের কী দায় পড়েছে সম্মান দেওয়ার!

গত বারো-তের বছর ধরে গিলোটিন শব্দটা বাংলা বিধানসভার অপরিহার্য একটা শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, বাজেটে তিন-চারটি বিষয় নিয়ে নম নম করে আলোচনা হবে। বাকি প্রায় পঞ্চাশখানা দপ্তর আলোচনা ছাড়াই পাস হয়ে যাবে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। পুলিশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ পঞ্চাশটির বেশি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বাজেট নিয়ে ন্যূনতম আলোচনাও হল না। সেই বাজেট পাস হয়ে গেল। অর্থাৎ, পঞ্চাশের বেশি দপ্তরের বাজেট গিলোটিনে চলে গেল।

আগে বাজেট অধিবেশন চলত একমাসের বেশি সময় ধরে। প্রায় সব দপ্তর নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্ক হত। কোনও কোনও বিষয় নিয়ে তো

তিনদিন, চারদিনও আলোচনা হত। কিন্তু সেসব পাঠ বিধানসভা থেকে কবেই উঠে গেছে। হয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব আলোচনা করা গেল না, তখন বিরোধীদের সম্মতি নিয়ে হয়তো একটা বা দুটো দপ্তর অল্প সময়ের আলোচনা হত। বা আলোচনা ছাড়া পাস হত। সেটা হয়তো উদ্যান পালন বা প্রাণী সম্পদ বিকাশ এই জাতীয় দপ্তর। কিন্তু এখন শিক্ষা, পঞ্চায়েত, পুলিশ, স্বাস্থ্য— সবই গিলোটিনে যায়।

এই গিলোটিনে পাঠানো— এটা নাকি স্পিকারের বিশেষ এক্তিয়ার। তিনি বিশেষ ক্ষমতাবলে এটা করতে পারেন। কী নির্লজ্জের মতো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সবাই সেসব ব্যাখ্যাও শুনেও নেয়। বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির মিটিংয়েও এই খামখেয়ালিপনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। মিডিয়াতেও ব্যাপারটা গা সওয়া। এটা নিয়ে তেমন কোনও উচ্চবাচ্যও হয় না। যেন, খুব সাধারণ একটা বিষয়। যেন খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়।

আসলে, পরিষদীয় রাজনীতি নিয়ে ন্যূনতম ধারণা ও শ্রদ্ধা না থাকলে, তবেই এমনটা করা যায়। তবেই এমন ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়। আসলে, আগে কীভাবে বিধানসভা চলত, সে সম্পর্কে এই স্পিকারের কোনও ধারণাই নেই। সেই সময় অধিবেশন হয়তো দেখেননি। কিন্তু স্পিকার হওয়ার পর তো পুরনো প্রসিডিংস পড়ে দেখতে পারতেন। যদি একদিনও পড়তেন, কাউকে বলতে হত না, তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন, এই চেয়ারে তিনি কতটা অযোগ্য।

আমরা শাজাহানদের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে যাই। আমরা পার্থ চ্যাটার্জিদের অপকর্ম শুনে রেগে যাই। এই স্পিকারের এমন অর্বাচীন আচরণের পর আমাদের রাগ হয় না কেন? এতগুলো দপ্তরকে গিলোটিনে পাঠানো খুন বা ধর্ষণের থেকে কোনও অংশে কম অপরাধ নয়। বরং এই অপরাধের মাত্রা অনেক বেশি। শুনতে হয়তো খটমট লাগবে। মনে হবে, একটু বাড়াবাড়ি। আসলে, এই মানুষটির জন্য আমাদের মনে এখনও তেমন রাগ বা ঘৃণা তৈরি হয়নি। এর কারণ আমাদের সহিষ্ণুতা নয়। এর কারণ আমাদের নিরেট অজ্ঞতা।

না, দোষটা স্পিকার মশাইয়ের নয়। তিনি কিন্তু বছরের পর বছর এই ‘গিলোটিন’ এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। গিলোটিনে পাঠানোর রেকর্ডও করে ফেলেছেন। তিনি কতখানি অর্বাচীন, এই নমুনা তিনি রেখেই চলেছেন। বুঝিনি আমরাই। এ দায় একান্তই আমাদের।

IS KOLKATA JUST ABOUT MALLS?
HAVE WE FORGOTTEN ITS HERITAGE
তাহলে, কলকাতা কি উঠল নিলামে ?
alamy - MD9XPR

ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন!

স্বরূপ গোস্বামী

প্রায় দশ বছর ধরে সিবিআই সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত চালাচ্ছে। শুরুর দিকে নাম কে ওয়াস্তে কয়েকজন চুনোপুঁটিকে ধরপাকড়। তারপরই বহু বছর ধরে তারা শীতঘুমে।
কেন? ওই যে বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন, সেই জন্য।

প্রায় বছর দুই ধরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সিবিআই আর ইডি তদন্ত করছে। কোর্টের ধাঁতানি খেয়ে শিক্ষামন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন। কয়েকজন অফিসার গ্রেপ্তার হলেন। ব্যাস, প্রায় সেখানেই থেমে গেল। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছর যায়। তদন্ত আর ফুরোয়া না। কোর্ট বারবার তিরস্কার করে। তবুও টনক নড়ে না। সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ। সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্ট। তারিখ পে

তারিখ। সিবিআই-ইডি ঘুমিয়েই থাকে। মাথা তো দূরের কথা, হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছতে পারে না। কেন? কেন আবার? ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

রাজ্যের নানা প্রান্তে অবাধে কয়লা তোলা হচ্ছে। এখান-সেখানে পাচার হচ্ছে। কারা যুক্ত, সবাই জানে। জানে না শুধু সিআইএসএফ। জানে না শুধু সিবিআই। তাই কিছু চুনোপুঁটিকে ডাকা হয়। বাকিরা কেউ দেশ ছেড়ে পালায়। কেউ দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।
কেন? কেন আবার? ওই যে বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে গরু পাচারের কথা রাজ্যের প্রায় সবাই জানেন। কোন পথ দিয়ে আসে। কোন রুটে পাচার হয়। কীভাবে পুলিশি কনভয়ে টাকা আসে। সেই টাকা কোথায় যায়। এগুলোও প্রায় সবাই জানে। জানে না শুধু সিবিআই। অথচ, তারা বছরের পর বছর তদন্ত করেই চলে। কেন আসল আসামীদের ছোঁয়া যায় না?
কেন আবার, ওই যে বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন। ওই যে বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলের দালাল হয়ে গেছেন।

কোনও এক কাকু। বীরদর্পে বলে গেলেন, আমার সাহেবকে কেউ ছুতেও পারবে না। তারপর যদিও বা সেই কাকু ধরা পড়লেন, অমনি চলে গেলেন বিখ্যাত উডবার্ন ওয়ার্ডে। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা কিছুতেই আর পাওয়া যায় না। ইডি-র লোকেরা নাকি দারুণ তৎপর। কিন্তু হাসপাতালের সুপার তাঁদের পাত্তাই দেন না। মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখেন। আচ্ছা, হাসপাতালের সুপার ইডি-কে এভাবে মাসের পর মাস লেজে খেলালেন কী করে? এত সাহস হয় কী করে?
ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

আবশেষে কোর্ট আবার ধাঁতানি দিল। আজকের মধ্যেই ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট নিতে হবে। বেচারা ইডির সামনে আর উপায় রইল না। রাতের মধ্যে স্যাম্পল নিতেই হল। এবার সেটা পাঠানো হবে হায়দরাবাদের কোনও এক ফরেন্সিক ল্যাবে। ওই রিপোর্ট এসে গেলেই নাকি কেল্লাফতে। এক মাস পেরিয়ে গেল, সেই রিপোর্ট এখনও এল না। আচ্ছা, ওই রিপোর্ট হাতে পেতে কতদিন লাগে? বিশেষজ্ঞদের মতে, বড়জোর এক থেকে দুদিন। তাহলে, একমাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আসছে না কেন?
ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

কোনও এক প্রভাবশালীকে মাঝে মাঝে ডাকা হয়। দীর্ঘ আট-নয় ঘণ্টা পর বীরদর্পে তিনি বেরিয়ে আসেন। নেতাজির মতো করে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। কখনও বলেন, সিবিআই-ইডি আমার কাঁচকলা করবে। কখনও বলেন, শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করা হল। কখনও বলেন, আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ বের করে দেখাক। আচ্ছা, সিবিআই-ইডি কে এমন হুমকি দেওয়ার সাহস তিনি পান কোথা থেকে?
ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

শেখ শাজাহান কোথায়? তিনি এবং তাঁর দুই লেফটেনেন্ট কর্নেল শিবু আর উত্তম। কী কী অপকর্ম করে বেড়িয়েছেন, এতদিনে সবাই জানেন। ইডির লোকজন সন্দেশখালি গেলে শাজাহান বাহিনী দারুণভাবে আপ্যায়ন করল।

তারপর থেকেই সেই মহানায়ক বেপাত্তা। ইডির হাতে নাকি রাষ্ট্রীয় মেশিনারি। আচ্ছা, এতদিন পরেও সেই শাজাহানের টিকিটি খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?
কেন আবার, ওই যে বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন।

রাজীব কুমার। সারদা কেলেঙ্কারির প্রমাণ লোপাটের দায়ে মূল অভিযুক্ত। তাঁকে নাকি সিবিআই হন্যে হয়ে খুঁজছিল। কয়েকদিন কতই না চাপানোতর। তাঁকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর থেকে সেই রাজীব বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। উল্টে সিবিআই বেপাত্তা হয়ে গেল। সেই রাজীব কুমার রাজ্য পুলিশের ডিজি পর্যন্ত হয়ে গেলেন। আচ্ছা, এই আইপিএস রা তো কেন্দ্রের ক্যাডার। কেন্দ্র তাঁদের কাছে নানা কৈফিয়ত চাইতেই পারে। ট্রান্সফারও করতে পারে। তাহলে তিনি এমন বহাল তবিয়তে আছেন কীভাবে?
ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন। তাই তো কেন্দ্র কিছু করতে পারছে না।

সিবিআই–ইডি তো আর রাজ্যের বাহিনী নয়। তখনও তারা পাঁচিল টপকে চিদাম্বরমের বাড়িতে ঢোকে। কখনও কুড়ি বছর আগের মামুলি এক মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে। আমাদের রাজ্যের বেলায় তারা এমন ধ্যাড়ায় কেন? এমন অপদার্থতার নজির রেখে যায় কেন? একটা সিভিক ভলান্টিয়ারও যেটা পারে, সর্বশক্তিমান সিবিআই–ইডি সেটুকুও পারে না কেন?
কেন আবার? ওই যে, বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন। আসলে, সিবিআই–ইডি তো প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে চলে না। চলে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কথায়। চাইলে এমন উদাহরণ আরও অনেক তুলে ধরাই যায়। যেখানেই কেন্দ্রের কিছু করণীয় থাকে, সেখানেই প্রশ্ন উঠে যায়, বুদ্ধিজীবীরা কোথায়? কোথায় গেলেন অপর্ণা সেন, কৌশিক সেনরা? আর আমরাও মেতে যাই সেই প্রচারে। আগে বামেরা বুদ্ধিজীবীদের নামে দু'চারটে গালমন্দ পেড়ে বিস্তর আনন্দ পেতেন। এখন সেই প্রচার হাইজ্যাক হয়ে গেছে। এখন বিজেপি, আইটি সেল সেই প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। বামেরাও নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে বলতে থাকেন, 'দেখেছো, আমরা যেটা বলতাম, এখন বিজেপিও সেটা বলতে শুরু করেছে!' তারপর পা–চাটা, চটি চাটা, দালাল — এসব বলে হয় রাগ ঠান্ডা করছেন। নইলে, তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন।

যেখানে যেখানে বিজেপি–র বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে পারত, যেখানে যেখানে কেন্দ্রের অপদার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত, সুকৌশলে সেগুলো ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের দিকে। আর বামেরাও দিব্যি তালে তাল দিয়ে যাচ্ছেন। ভাবছেন, ফেসবুকে বুদ্ধিজীবীদের গাল পেড়ে, বা গালাগাল দেওয়া পোস্টে লাইক দিয়ে বিপ্লব আনবেন।

কোন ফাঁদে পা দিচ্ছেন, বোঝার বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। ধন্যি জুকেরবার্গ। কী অদ্ভুত একটা জিনিস বানিয়েছেন। শুধু একটা ফেসবুক, মানুষের চিন্তা–চেতনাকে কতখানি নির্বোধ বানিয়ে দিতে পারে।

কমরেড, ভাবুন, ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।।

স্বীকারোক্তি

স্কুল ম্যাগাজিনে না দেওয়া সেই লেখা

ছোট ছোট ভুল অনেক সময় বারবার মনে পড়ে যায়। অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও ভোলা যায় না। তেমনই একটি ভুলের কথা বলে হয়ত কিছুটা হালকা হতে পারব। তখন বোধ হয় ক্লাস নাইনে পড়ি। ক্লাসে নোটিশ দেওয়া হল, স্কুল ম্যাগাজিন বেরোবে। যারা যারা লেখা দিতে চায়, তাদের সাত দিনের মধ্যে লেখা দিতে হবে।

আমি বোধহয় সেই বিরল বাঙালিদের একজন, যে সারা জীবন একটিও কবিতা লেখেনি। তাই আমার লেখা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু দেবরাজ আমাকে একটি কবিতা দিয়েছিল। সে জ্বরের জন্য কয়েকদিন স্কুলে যেতে পারেনি। এক বন্ধুর কাছে লেখা দেওয়ার কথা শুনেছিল। দেবরাজ আমাকে বলল, তুই তো স্কুলে যাচ্ছিস। এই লেখাটা বাংলার স্যারকে দিয়ে দিস। আমি যথারীতি লেখাটা দিতে ভুলে গেলাম। তিনদিন পর মনে পড়ল। তখন আর লেখাটা খুঁজেও পেলাম না। কী জানি, কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। দেবরাজ লেখাটার ব্যাপারে আমাকে আর জিজ্ঞাসাও করেনি।

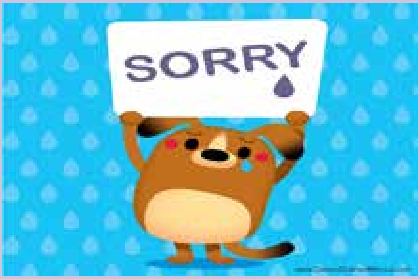

ম্যাগাজিন বেরোলো। তাতে দেবরাজের লেখা নেই। থাকার কথাও ছিল না। দেবরাজ ভেবেছিল, ওর লেখা হয়ত স্যারের ভাল লাগেনি। তাই ছাপা হয়নি। হয়ত মনে মনে স্যারের প্রতি রাগও হয়েছিল। কিন্তু আমি যে লেখাটা জমাই দিইনি, সেটা ওকে জানাতেও পারিনি। সেই ভুলের বোঝা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। দেবরাজ, সেদিনের সেই ভুলের কথা এতদিন পর তোর কাছে স্বীকার করছি। ওটাকে ভুল হিসেবেই দেখিস। বিশ্বাস কর, সেই ভুলটা ইচ্ছাকৃত ছিল না।

সজল চক্রবর্তী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(স্মৃতিটুকু থাক। পাঠকের মুক্তমঞ্চ। এখানে ফেলে আসা জীবনের অনেক স্মৃতি উজাড় করে দিতে পারেন। অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা কোনও ভুল স্বীকার করে নিজের মনকে কিছুটা হালকাও করতে পারেন। লিখে পাঠানা আপনার অনুভূতির কথা)

গল্প

স্বপ্ন মেদুর

কুমকুম বসু দাস

পাঁচটা বেজে পঁচিশ। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে আলাপ। এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট। ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে ও। তবুও মনে হয়, দেরি হয়ে গেল। আসলে ঘড়িটা একটু এগিয়েই রাখে আলাপ। কারণ, সুলগ্না কখনই ছ'টা বেজে পাঁচ–সাত মিনিটের বেশি দেরি করে না। ভয় থাকে সুলগ্না কখন ওর চারতলার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে - আরও দুতলা উঁচু অর্থাৎ ছ'তলার ঘরে বসে আলাপ তা টেরই পাবে না। ফেরার সময় ভীষণ তাড়া থাকে সুলগ্নার। কী একটা নাকি গ্যালপিন ট্রেন আছে - সুলগ্নাদের ওখানেই প্রথম স্টপ। তাই ওই ট্রেনটা ও মিস করে না কিছুতেই।

এক এক সময় রাগ হয় আলাপের। কী দরকার ওর চাকরি করার। বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। বাবা সি ই এস সি–র চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। ভাই কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স করে পি এইচ ডি করছে। কী দরকার এত পরিশ্রমের চাকরির। বাড়িতে থাকলে তুমি আরও সুন্দর হতে। তোমার পাতায় ঘেরা গভীর চোখ দুটোর নীচে একটুও কালি জমত না।

এসব কি ভাবছে আলাপ! এখনও তো ওকে আর পাঁচজনের মতো ‘মিস্ দাশগুপ্ত’, ‘আপনি’ বলেই ডাকে আলাপ। তবে হ্যাঁ, প্রশ্নটা ওকে করেছিল। সুলগ্না বলেছিল, ‘কেন? ভাল পোস্ট, মনের মতো স্যালারি। শুধু শুধু বাড়ি বসে কী করব বলুন।’

সত্যি তো। এত অবুঝ আলাপ। যদি সুলগ্না দাশগুপ্ত নামের এই মিষ্টি মেয়েটি এই ফার্মে চাকরি না নিত, তবে তাকে কোথায় পেত আলাপ সেন! না, তবে সুলগ্না কি চিরকাল চাকরি করবে। না, তার কখনই করতে দেবে না আলাপ!

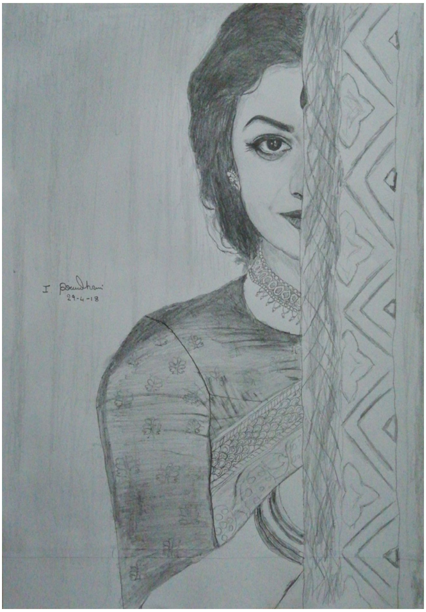

***

আজ দুটি বছর ধরে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে আলাপ। স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের আবরণে অন্য সকলের মতো আলাপের কাছেও নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সুলগ্না। তাতে আলাপ দমে যায়নি। বরং কালচার্ড ফ্যামিলির সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে এসেছে বলেই যে প্রগল্ভা হবে, তা চায় না আলাপ। কিন্তু ভালোবাসা অন্তর্যামী। সুলগ্না ওর মন বোঝে না এমন হতেই পারে না। বাড়ি ফেরার পথে বাসের পনেরো মিনিটের সান্নিধ্যে সুলগ্না হাসে, কথা বলে। মনে মনে তখন অনেক বেশি পায় আলাপ। সেই সেদিন

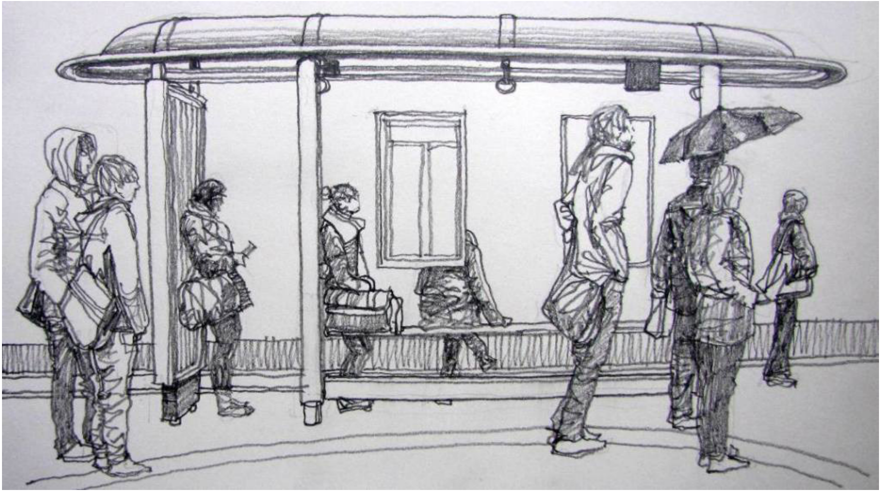

- ভীষণ বৃষ্টিতে ট্রাম নেই, বাস নেই, কোনওমতে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল সুলগ্না। আলাপ সারাটা পথ ওর সঙ্গে ছিল। জলে কাদায় সুলগ্নার শাড়ির অনেকটা অংশ ভিজে গিয়েছিল। ওর ফর্সা ভিজে গোড়ালিটা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল আলাপের। তবুও একদিন কার যেন মৃত্যুর জন্য আগে আগে অফিস ছুটি হল। বাসে সুলগ্নার পাশে একই সিটে বসেছিল আলাপ। বাসের ঝাকুনিতে সুলগ্নার মৃদু ছোঁয়া লাগছিল আলাপের গায়ে। রোমাঞ্চিত আলাপ এখনও অনুভব করে সেই মুহূর্তটা।

****

সুলগ্না - সুলগ্না - তোমাকে নিয়ে কতদিন চলে গেছি মাঠ পেরিয়ে - ছোট্ট নদী ডিঙিয়ে। তোমার কোমর ছাপানো চুলের গোছা বাতাসে এলোমেলো। আমার হাতে হাত রেখে তুমি ভেসে ভেসে চলেছো। এমন সময় বৃষ্টি এল ঘনিয়ে। বাতাসে জলের গন্ধ। নাম না জানা নদীর ধারের শিমূল গাছের তলায় ডানা ভেজা পাখির মতো থামলে তুমি। আকাশে মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ধরা দিল মাটির বুকে, আমার কাছে তেমনি ধরা দিলে তুমি!

‘কীরে, বেরোবি না আজ?’ সৃজনের ডাকে চমকে ওঠে আলাপ। নিশ্চয় চলে গেছে সুলগ্না। শিয়ালদা রুটের বাস অনেকগুলো আছে। নিশ্চয় রাগ করে তার একটাতে চলে গেছে।

যাবার আগে ওর আয়ত চোখ দুটো বার বার তাকিয়েছে দশতলা বিল্ডিংটার ছ'তলায়। ওর টিকলো নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অনেকগুলো বাস ছেড়ে তারপর আশপাশের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াতে বাসে উঠেছে। ‘কি মিঃ সেন, কাজের চাপ ছিল বুঝি আজ?’ এ কি, সুলগ্না তবে যায়নি! আলাপের জন্য দাড়িয়ে আছে! মৃদু হেসে আলাপ বলে- ‘না, মানে - আপনি বাস পাননি?’ সুলগ্না লাজুক মুখে বলে, ‘আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।’

আলাপ ঠিক শুনছে তো! সুলগ্না আলাপের জন্য অপেক্ষা করছিল! সুলগ্না, আমি জানতাম, আমার প্রতীক্ষা মিথ্যে হবে না। সুলগ্না, সেই কত দিন ধরে, লক্ষ কোটি বছর ধরে...... সৃষ্টির মুখে যেদিন প্রথম কথা জেগেছিল - জলের ভাষায় - হাওয়ার কণ্ঠে - সেই আদি যুগ থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্য।

‘মিঃ সেন, আগামী রবিবার আমাদের বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ। কাল আমি আসছি না। পরশু সেকেন্ড স্যাটারডে। সময় পাব না আর।

আমি স্টেশনে লোক পাঠাব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।' বলতে বলতে এক টুকরো কাগজে সব লিখে বুঝিয়ে দিল সুলগ্না। তারপর অভিভূত আলাপের খেয়াল নেই কখন সম্মতি জানিয়েছে, একসঙ্গে বাসে উঠেছে এবং নির্দিষ্ট ষ্টপেজে নেমেছে।

****

এরপর এসেছে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে পার হয়েছে কটা স্টেশন। তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ত বা একটু নার্ভাস আলাপ নেমেছে শ্যামনগরে। আচ্ছা, সেদিন তো সুলগ্নাকে জিজ্ঞাসা করা হল না, কী উপলক্ষে যেতে বলেছে ও। তবে কি সুলগ্নার জন্মদিন। কোনও উপহার আনা হল না তো!

'একসকিউজ মি, আপনি কি মিস্টার আলাপ সেন?' সুদর্শন এক তরুণের প্রশ্নে চমক ভাঙে আলাপের। 'হ্যাঁ----'। 'সুলগ্না আমার দিদি। আপনাকে নিতে এসেছি।' স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকুর মধ্যেই যথেষ্ট ভাব জমে উঠেছিল সুলগ্নার ভাইয়ের সঙ্গে। খুব মিশুকে ছেলে। স্বল্প ভাষিনী সুলগ্নার ভাই বলে মনেই হয় না। শুধু ও নয়। সুলগ্নার বাবা-মাও সমান আন্তরিক। কথায় গল্পে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের করে নিয়েছিলেন আলাপকে।

ছোট্ট সুন্দর বাড়িটা বেশ ছিমছাম - যেন কোনও নিখুঁত শিল্পীর হাতে সাজানো। ব্যালকনিতে বসলে দেখা যায় চারিদিকে জানা-অজানা গাছের সমারোহ। সুলগ্না, আমাদের ঘরটাও হবে ঠিক এমনই সবুজের মাঝখানে। জনারণ্য থেকে অনেক দূরে। তোমার হালকা রঙের শাড়ির ঘোমটা সরিয়ে একরাশ ঘন মেঘের মতো চুলে মুখ ডুবিয়ে বলব---।

একি! সুলগ্না কাঁদছে? টেবিলের উপর রাখা ওই ফটোতে মালা পরিয়ে - ধূপ জ্বালিয়ে - ওই প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কেন কাঁদছে সুলগ্না? 'মিঃ সেন, কেন কাঁদছি! আজ তিন বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমি কাঁদছি। যার ফটো দেখছেন - আজ থেকে চারবছর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমরা এক হয়ে ছিলাম। তারপর শুধু একটি বছর। অ্যাক্সিডেন্ট। মোটর দুর্ঘটনা ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে। একটু এগিয়ে বিছানায় শোয়া ছোট্ট এক শিশুকে বুকে তুলে নিল সুলগ্না। আদরে আদরে অস্থির করে তুলল ঘুমন্ত শিশুকে। 'মিঃ সেন, এই আমাদের ছেলে। শুধু ওর মুখ চেয়ে এই বিষাক্ত জীবনটা ধরে রাখতে হল। একি, আপনার চোখে জল কেন? আমি বিধবা বলে? কে বলেছে - দেখছেন না - আমি ভাল ভাল শাড়ি, গয়না পরি। প্রসাধন করি। আমার স্বামী প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গে আছেন। সকলে আড়ালে কথা বলে। কিন্তু আমি সুন্দর হয়ে থাকি। ও যে তাই চাইত।'
একটা যন্ত্রণা চেপে আবার বলল - 'ওর পছন্দটুকু আজও ধরে রেখে আমি কি অন্যায় করেছি! মিঃ সেন, আমি দুঃখী, কাউকে সুখী করার অধিকার আমার নেই।'

ফেরার ট্রেনে আলাপ স্থানুর মতো বসেছিল। কিছু কথা বুক ঠেলে উঠে আসছে। 'সুলগ্না, আমার ভালোবাসাকে তুমি চিনেছিলে বলেই আজ কাছে ডেকে এমনি করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলে। তাই আজ আরও অনেক বেশি সুন্দর তুমি! কত যে সুন্দর, তা তুমি নিজেও জানো না।'

ওপেন ফোরাম

এই অর্বাচীনদের কেন যে পাঠানো হয়!

অজয় কুমার

রাজ্যে গালভরা নানারকম কমিশন আছে। মহিলা কমিশন, শিশু অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি। কেন্দ্রেও এমন নানা গালভরা কমিশন আছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, এই কমিশনগুলো ক্রমশ নিজেদের হাসির খোরাক করে তুলছে। একের পর এক ঘটনায় তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই, কণ্ঠস্বরও নেই। সরকার যেটা শুনতে চায়, তাঁরা সেটাই বলবেন।

রাজ্য সরকার শুরু থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের অবস্থান কী। সন্দেশখালিতে এমন ভয়াবহ অভিযোগের পরও সরকার ব্যস্ত সেই অভিযুক্তদের আড়াল করতে। কিন্তু শুধু সরকার বললে, শুধু পুলিশ বললে, ব্যাপারটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য হবে না। অতএব, পাঠাও মহিলা কমিশনকে। পাঠাও শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনকে। গেলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। গেলেন সুদেষ্ণা রায়। তাঁদের মূল বক্তব্য কী? কোনও মহিলা নাকি শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানাননি। কেউ নাকি ধর্ষণের অভিযোগ জানাননি। হ্যাঁ,

এটাই তো শুনতে চাইছিল সরকার।

কোথাও অনিয়ম হলে এইসব কমিশনের প্রতিনিধিরা যাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটা মহৎ গুণ আছে। তিনি অনেক কিছুই দুম করে বলে বসেন। যেটা না বললেই ভাল হত, কৃতিত্ব নিতে গিয়ে সেটাও বলে বসেন। তিনি বলে দিলেন, আমি মহিলা কমিশনকে পাঠিয়েছিলাম। ওরাও কিছু পায়নি। আচ্ছা, মহিলা কমিশনকে কি সরকার এভাবে নির্দেশ দিতে পারে? অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই যে তাঁরা এসেছেন, সেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পরিষ্কার করে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পাঠালে যা হয়, তাই হয়েছে। তাঁরা সেটাই বলেছেন, যেটা মুখ্যমন্ত্রী শুনতে চান। কমিশন আসলে কাদের স্বার্থরক্ষা করছে, আরও একবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

এবার কেন্দ্র। মাঝে মাঝেই কেন্দ্রের দল আসে। প্রতিবার ফিরে যাওয়ার আগে তাঁরা বিস্তর বিবৃতি দিয়ে যান। যার বেশিরভাগটাই ওই চেয়ারে বসে বলা যায় না। বেশিরভাগটাই রাজনৈতিক বিবৃতি। বলে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেব। কী রিপোর্ট দিয়েছেন? তার কী ফল হয়েছে? ঘুরে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন রেখা শর্মা। আগেও বেশ কয়েকবার ঘুরে গেছেন। নানা বিবৃতি দিয়ে গেছেন। এবারও বলে ফেললেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। তিনি নাকি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা যেতেই পারে। কিন্তু এটা যে মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সনের চেয়ারে বসে বলা যায় না, এই ন্যূনতম বিষয়টা যিনি জানেন না, তিনি এরকম একটা চেয়ারে বসে আছেন? তিনি নাকি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করবেন। আচ্ছা, এরকম সুপারিশ করার এক্তিয়ার আছে? এইসব অর্বাচীনদের কারা ওই চেয়ারে বসায়? মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সনের ওই পদটা বাজার গরম করার জন্য নয়। বিবৃতি দেওয়া জন্য নয়। আচ্ছা, আগেও তো এতবার এসেছেন। এতবার রিপোর্ট দিয়েছেন। সেইসব রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কী হল?

রেখা শর্মা আগেও বহুবার অভিযোগ করেছেন, ডিএম-এসপি রা নাকি সহযোগিতা করেননি। মুখ্যসচিব নাকি দেখা করেননি। মানে, পাত্তা দেননি। হ্যাঁ, সত্যিই পাত্তা দেননি। কেন দেননি, জানেন? কারণ, তাঁরাও জানেন, আপনাদের কমিশনের মুরোদ কত। তাঁরা জানেন, আপনাদের এইসব কমিশনের রিপোর্টের কোনও মূল্যই নেই। তাঁরা জানেন, কেন্দ্রের মন্ত্রী বা আমলারাও আপনাদের শুধুমাত্র পেটোয়াই মনে করে, তার বেশি কিছুই মনে করে না। কেন্দ্র যদি সত্যিই রাজধর্ম পালন করতে পারত, তাহলে রাজ্য পুলিশের এতখানি সাহস হত না। আপনাদেরও সন্দেশখালিতে আসতে হত না।

ওপেন ফোরাম

অহেতুক জটিলতা বাড়াচ্ছে রেল

সৌম্যজিৎ চৌধুরি

সহজ কাজকে কীভাবে জটিল করতে হয়, তা বোধ হয় ভারতীয় রেলকে দেখে শিখতে হয়। অনেকেই আইআরসিটিসি থেকে টিকিট কাটেন। যাঁরা আগে কেটেছেন, তাঁরা যদি এখন সেই সাইট খোলেন, চিনতে পারবেন না। সংস্কারের নামে, আপগ্রেডেশনের নামে অহেতুক কিছু জটিলতা বাড়ানো হয়েছে। ফলে, টিকিট কাটা মানে বিরাট এক ভোগান্তি।

রেলের সঙ্গে অনেককিছু জুড়েছে। বিমানের টিকিট যুক্ত হয়েছে। ওলা ক্যাবের পরিষেবা চালু হয়েছে। ই ক্যাটারিং যুক্ত হয়েছে। রেল আবার প্যাকেজ ট্যুরেও হাত দিয়েছে। চাইলে নিজে পুরো ট্রেন ভাড়াও নিতে পারেন। হোটেল বুকিং করতে পারেন। সবমিলিয়ে নানা কর্মকাণ্ড। কিন্তু একশো জন টিকিট কাটলে এগুলো কজনের দরকার হয়? অধিকাংশ যাত্রী শুধু টিকিটই কাটেন। তাই তাঁরা যেন কম ঝামেলায় টিকিট কাটতে পারেন, সেটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তার বদলে তাদের জটিলতা অনেক বেড়ে গেছে। আগে সহজেই টিকিট কাটা যেত, এমনকী যাঁরা ইন্টারনেটে তেমন সড়গড় নন, তাঁরাও সহজে টিকিট কাটতে পারতেন। তার বদলে আরও হাজার গন্ডা পরিষেবা সামনে আনতে গিয়ে আসল কাজটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে বিজ্ঞাপনের উটকো উৎপাত। নানারকম উইন্ডো খুলে যাচ্ছে। ভুল করে ক্লিক করলেই সর্বনাশ। আসল জায়গা থেকে সরে গিয়ে আপনি বিজ্ঞাপনের ভুলভুলাইয়ায় ঢুকে পড়লেন।

যাঁরা নানারকম পরিষেবা চান, তাঁরা জানেন কোথায় গেলে পাওয়া যায়। তাঁরা অনেকটাই টেক স্যাভি। কিন্তু যাঁরা সাধারণ যাত্রী, তাঁদের অকারণ ভোগান্তির মধ্যে না ফেলাই ভাল। রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইআরসিটিসি সাইটটিকে দয়া করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিন। এই জটিলতা থেকে মুক্তি দিন।

স্টার জলসা
Telly বং

বিনোদন

সিরিয়াল বন্ধ করুন, দেখবেন ঝগড়াও থেমে গেছে

স্নেহা সেন

এই মুহূর্তে আমাদের সমাজের সবথেকে বড় সমস্যা কী ? নানা মুণি নানা মত দেবেন। তাঁদের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। বিশেষ করে মহিলারা একেবারেই একমত হবেন না। তবু আমার মতামতটা বেঙ্গল টাইমসের মাধ্যমে জানিয়ে রাখি। এই মুহূর্তে যে বিষয়টি সবথেকে বিরক্তিকর লাগে, তা হল বাংলা সিরিয়াল।

একসময় তেরো পার্বন দেখেছি। নয়ের দশকেও বেশ কিছু ভাল সিরিয়াল হয়েছে। জননী আর জন্মভূমির পর থেকেই গাঁজাখুরি সব সিরিয়ালের শুরু। এখন তা মহামারির চেহারা নিয়েছে। সন্ধে বেলায় কারও বাড়িতে যান। আপনি নিশ্চিত থাকুন, কেউ এক কাপ চা দেবে না। এমনকি মুখ তুলে আপনার সঙ্গে কেউ কথাও বলবে না। বরং বুঝিয়ে দেওয়া

হবে, এই সময় বাড়িতে এসে আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। সব বাড়িতেই সিরিয়ালের মহাযজ্ঞ। যেমন নাম, তেমন তার কাহিনী বিন্যাস। কী করে মানুষ সেগুলো গিলছে, সেটা ভেবে অবাক হতে হয়।

সিরিয়াল মানেই ঝগড়া, কুচুটেপনা। গা ভর্তি গয়না, ড্রয়িং রুমে সেজেগুজে সবার গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আর মাঝে মাঝেই ঝমঝম করে উদ্ভট সব মিউজিক। পরকীয়ার ছড়াছড়ি। কে যে কার বউ, কার যে কটা বিয়ে, কোনও ঠিক নেই। বিভিন্ন পরিবারে ঝগড়ার উৎস হল এইসব গাঁজাখুরি সিরিয়াল গুলো। শাশুড়ি শিখছে কীভাবে বউমাকে টাইট দেওয়া যায়। আর বউমা শিখছে কীভাবে ঘরভর্তি লোকের সামনে শাশুড়িকে অপদস্থ করা যায়। কী করে পাশের বাড়ির দুই বউয়ের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। নিজের নিজের পরিবারে তা প্রয়োগ করছে। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে।

আমার পরিচিত বেশ কয়েকটি পরিবারেই দেখছি এই সিরিয়ালের দাপট। কারও সঙ্গে কারও সদ্ভাব নেই। সবাই যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের নাগরিক। এমন এমন তুচ্ছ কারণে ওরা ঝগড়া করে, খুব রাগ হয়। যে অশান্তিটা অনায়াসে এড়ানো যায়, সেটাকে এরা বাড়িয়ে তোলে। সহজ একটা ব্যাপারকে অহেতুক জটিল করে তোলে। অথচ, বছর খানেক আগেও কিন্তু মানুষগুলো এরকম ছিল না। যতরকমের কুশিক্ষা ওরা পাচ্ছে এই সিরিয়াল থেকে।

সবাই কেমন গা ভর্তি গয়না পরে বা দামি শাড়ি পরে ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে এমন গয়না আর দামি শাড়ি পরে যারা থাকে, তাদের পাগল ছাড়া কী বলবেন ? মুকেশ আম্বানির স্ত্রীও বোধ হয় ঘরের মধ্যে এভাবে সেজে থাকে না।

কিন্তু যারা এগুলো দেখে, তারা এগুলো কোনওদিনও বুঝবে না। তারা যুক্তি, বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে। সিনেমায় সেন্সর বোর্ড আছে। সিরিয়ালে এমন সেন্সর বোর্ড করা যায় না ? গাঁজাখুরি বিষয় বা সংলাপে নিয়ন্ত্রণ আনা যায় না ? যদি এই সিরিয়াল নিষিদ্ধ করা হয় ? আমি সত্যিই খুশি হব। আশা করি, আমার মতো আরও অনেকেই খুশি হবেন।

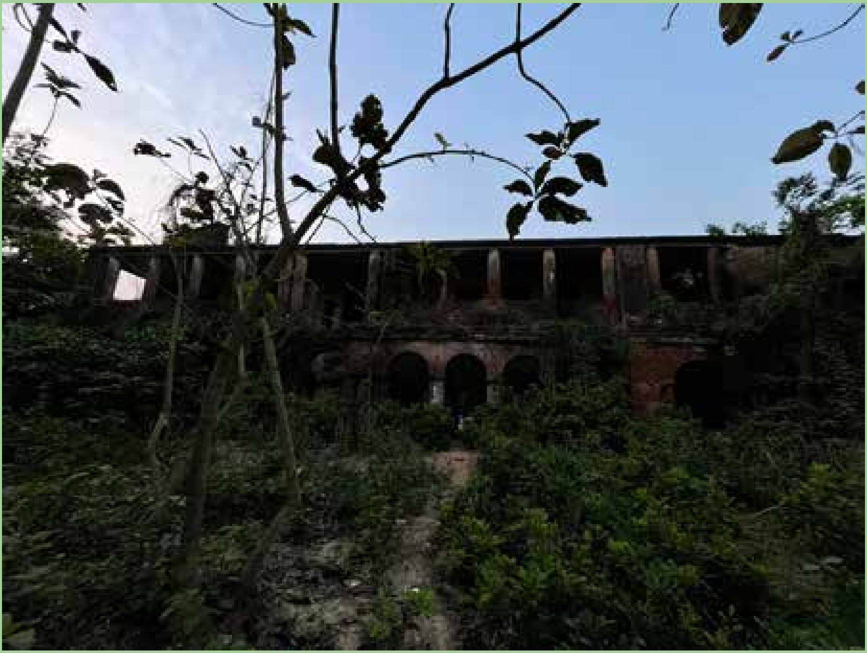

নীল সাহেবের কুঠি

শাশ্বত মজুমদার

পয়লা বৈশাখে ঘুরে এলাম ভাল ভূতের দেশ। জায়গাটার নাম মঙ্গলগঞ্জ। নিউ টাউনে আমার ফ্ল্যাট থেকে ৯৩ কিমি। সেলফ ড্রাইভ অবশ্যই। সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম, ঘণ্টা আড়াই লাগল পৌঁছতে। হাবড়া, ঠাকুর নগর, চাঁদ পাড়া হয়ে যাওয়া যায়। আমরা গিয়েছিলাম বারাসাত, হরিণ ঘাটা, চাকদা হয়ে। রাস্তা মোটামুটি, খুব ভাল বলা যাবে না।

মাঝে কোনও ব্রেক ছিল না। মঙ্গলগঞ্জ পৌঁছে গেলাম ১০ টা নাগাদ। ব্যাকপ্যাকার্স ক্যাম্পে ঢোকার রাস্তা বেশ সরু, আলপথ বলা যেতে পারে। একটু বড় গাড়ি হলে অসুবিধে হতে পারে।

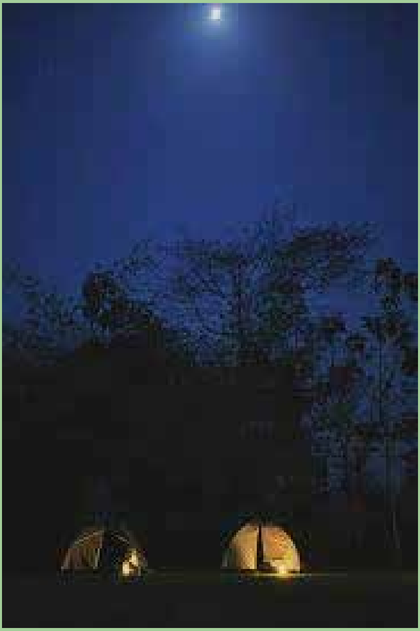

ক্যাম্পের গেট টাও বেশ সরু, বড় গাড়ি হলে একটু অসুবিধে বইকি। তবে ক্যাম্পের জায়গাটা কিন্তু অসাধারণ।

একদিকে টেন্ট আর একদিকে বাম্বু কটেজ। আমরা কটেজ নিয়েছিলাম। মাঝে একটা সুন্দর বড় লন। গাছপালা ভর্তি। ওখানে আলাপ হল পুষ্পার সঙ্গে। পুষ্পার চোখ দুটো অসাধারণ। একবার তাকালে ফেরানো মুশকিল। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক। গরম প্রচণ্ড ছিল, অনেক আরাম পেলাম। ব্রেকফাস্টের পর ওখানকার অ্যাটেন্ডেন্টদের সঙ্গে শুরু হল গল্প। এই জায়গায় ছিল নীল সাহেবদের কুঠি, এখানেই হত নীল চাষ। চাষিদের জোর করে নীল চাষ করাতো ইংরেজরা। আর সেই নীল বিদেশে এক্সপোর্ট হত। এক নীল সাহেবকে এক দিন গলা কেটে মেরে ফেলে চাষিরা। সেই থেকে ওই নীল সাহেবের অতৃপ্ত আত্মা নাকি ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

সেই নীল সাহেবের কুঠি ক্যাম্প থেকে খুব একটা দূরে নয়। দুপুরে লাঞ্চ করলাম, একদম বাড়ির মতোই খাবার— ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ, চাটনি। সাদা সাপটা খাবার কিন্তু খুব সুন্দর স্বাদ। খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে। নীল সাহেবের কুঠি পার হয়েই ইছামতী নদী, হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। দিনের আলোয় কুঠি দেখে কিন্তু ভয় লাগল না। উল্টে পুরো ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। পুরনো কনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে পড়েছে, ভাঙ্গা সিড়ি, ভগ্নপ্রায় বারান্দা, অনেক ছবিতে তুললাম স্বামী স্ত্রী বাচ্চা মিলে।তারপর গেলাম নদীর দিকে।ওখানে নৌকো বিহারের লোভ সামলাতে পারলাম না। দু ঘণ্টা নৌকো করে নদীতে ঘুরলাম। নদীর ওপাশে পারমাদান অভয়ারণ্য। সন্ধ্যে হয়ে গেছিলো বলে আর যাওয়া হয়নি। যাই হোক, নৌকো বিহার করে পাড়ে উঠে পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরে, চা বিস্কুট খেয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্প। ফেরার পথে একটা গ্রামের দোকানে বসে কিছুক্ষণ গপ্পো করলাম দোকানের মালকিনের সঙ্গে। ক্যাম্পে ফিরে বড়সড় চমক ছিল। দুর্দান্ত bar b q এর প্ল্যান হল। ক্যাম্পে ছিল আমাদের মতই আর একটা ফ্যামিলি, আর একটা জনা আটেক কলেজ পড়ুয়া ছেলের গ্রুপ। Bar b q শেষ হওয়ার পর ছিল আসল সারপ্রাইজ। ওখানকার একজন attendant প্রস্তাব দিল আমাদের অন্ধকারে নীল কুঠির দিকে যাওয়ার জন্যে। সামনে ও যাবে হ্যারিকেন নিয়ে, আর পেছনে আমরা সবাই, ওই ১২/১৪ জন।সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।বলে

বোঝানো যাবেনা, গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো।

অনেক রকম ভূত আর অশরীরীর গল্প শুনলাম। তার পর হাঁটতে হাঁটতে ইছামতী নদী, উফ্, সে এক এক্সপেরিয়েন্স। নদীর ঘাটে সিড়িতে বসে সবাই যে যার নিজের ভৌতিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করল। এসবের মধ্যেই ঘাটের সিড়িতে হঠাৎ আর একটা যে ফ্যামিলি ছিল, ভদ্রলোকের স্ত্রী পড়ে গেলেন হোঁচট খেয়ে। পায়ের আঙুল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। তাঁর মনে হয়েছে কেউ নাকি ওনাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে। যাই হোক, সবাই বেশ ভয় পেয়েছিল সে রাতে, ফিরে এলাম ক্যাম্পে। এসে ডিনার সারলাম রুটি/ভাত চিকেন। অসামান্য টেস্ট, এখনও মুখে লেগে আছে। ছেলেদের গ্রুপটা পার্টি করছিল, গিটার বাজিয়ে গান করছিল, বেশ ভাল লাগছিলো পরিবেশটা। আর একটা যে ফ্যামিলি ছিল, ওদের বছর সাতেকের ছেলের সঙ্গে আমার ছয় বছরের মেয়ের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল, সে দুজনের কি গল্প। এসব করতে করতে রাত হয়ে গেল, ঘুমও পাচ্ছিল।

একটা উৎপাত আছে ওখানে, সেটা হচ্ছে আরশোলা আর মাকড়সা, ঘরের মধ্যে। লাল হিট আর mosquito cream অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। আমাদের গোটা সাতেক আরশোলা মারতে হয়েছিল। মজাটা হচ্ছে, দিনের বেলা যেখানে গরমে টেকা যাচ্ছিল না, সেখানে রাতে লাগছিলো ঠান্ডা। ঘরে একটা সিলিং ফ্যান আর একটা স্ট্যান্ড ফ্যান ছিলো, স্ট্যান্ড ফ্যান টা বন্ধ করে ঘুমোতে হলো। সারা দিনের ক্লান্তি ছিল, ঘুমিয়েও পড়লাম। পর দিন সকালে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতার উদ্দ্যেশ্যে। ওখানকার ঘর গুলোর নাম গুলো অদ্ভুত, পেত্নী, ব্রহমদৈত্য, শাঁখ চুন্নি, ডাইনিং হলের নাম নরখাদক। গুপী বাঘার ভূতের রাজার সঙ্গে selfie মিস করা যাবে না কিন্তু।

সব মিলিয়ে ২২/২৩ ঘণ্টা অসাধারণ কেটেছিল। হয়তো গরম বলে একটু কষ্ট হয়েছে, বর্ষা বা শীত কালে এই জায়গাটার রূপ অসাধারণ হওয়া উচিত, ইচ্ছে আছে শীতকালে আরেক বার ঢু মারার। শহরের কোলাহল, ব্যস্ততা আর ইট কাঠ পাথরের আবর্জনা থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় সবুজের মাঝে হারিয়ে যেতে হলে একবার ঘুরে আসবেন 'ভালো ভূতের দেশ' থেকে। মিশকালো অন্ধকারে ইছামতির ওপর শয়ে শয়ে জোনাকির মিটমিটে আলো আর সঙ্গে পূর্ণিমার ঝকঝকে চাঁদ পেলে তো কথাই নেই।

ব্যাকপ্যাকার্স ক্যাম্পকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরম একটা অসাধারণ জায়গা খুঁজে বের করার জন্যে।

চা বাগানের মাঝ দিয়ে কমলার বাগানে

স্বপ্নময় সেন

কমলালেবুর গ্রাম বলতেই সবার আগে ভেসে ওঠে সিটংয়ের নাম। ঘরে ঘরে থরে থরে কমলালেবুর গাছ। ইচ্ছেমতো পেড়ে নিলেই হল। কমলালেবুর খোঁজে সিটং গিয়ে হতাশও হতে হয়েছে। কমলার সিজন না জানলে যা হয়! মার্চ, এপ্রিলে গেলে কি আর কমলালেবুর দেখা মেলে!

আবার উল্টোটাও হয়েছে। কমলালেবু দেখার কোনও সুদূরতম আশাও ছিল না। কিন্তু একের পর এক কমলার বাগান। ইচ্ছেমতো লেবু পেড়ে নেওয়ার হাতছানি। এটা অবশ্য সিটং নয়, তাবাকোশিতে। তাবাকোশি যাওয়া মূলত চা-বাগানের সান্নিধ্য পেতে। মিরিক পেরিয়ে ছোট্ট এক পাহাড়ি জনপদ। অলসভাবে দু-তিন দিন কাটানোর আদর্শ জায়গা। এখানে যে এমন

কমলার বাগান আছে, কে ভেবেছিল!

এক বন্ধুর কাছে প্রথম শুনেছিলাম তাবাকোশির কথা। তবে সে কিন্তু কমলালেবুর কথা বলেনি। আসলে, সে কমলালেবু দেখেইনি। সে গিয়েছিল, এমন সময় যখন কমলালেবু হয় না। তাছাড়া সে তাবাকোশিতে যত না সময় ছিল, তার থেকে বেশি ঘুরেছে আশপাশের জায়গায়। পুরীতে গিয়ে সবাই যা করে। আশপাশের উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কোনারক, নন্দন কানন এসবের চক্করে পড়ে আর পুরীটাই ঘোরা হয় না। তারও হয়ত তেমন দশাই হয়েছিল। আশপাশ ঘুরতে গিয়ে পায়ে হেঁটে তাবাকোশিটাই ঘোরা হয়নি। আমরা অবশ্য তাবাকোশি গিয়ে সেই ভুলটা করিনি। ঠিক করেই নিয়েছিলাম, নো সাইট সিন। অলসভাবে দুটো দিন তাবাকোশিতেই কাটাব।

মিরিক বলতে ছোটবেলায় দেখা মিরিক লেক। সে এক নস্টালজিয়া। মনে আছে, প্রথম বোটিং করেছিলাম এই মিরিকেই। মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকাই ছিল। কিন্তু সেই লেকের এ কী দশা! যেন এঁদো পুকুর। দেখেই আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না। অন্য সময় লেকটা বেশ সেজেই থাকে। বোটিং তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে ঘোড়ায় চড়ার হাতছানিও। কিন্তু লকডাউনে পর্যটকের দেখা নেই বলেই হয়ত সেভাবে সেজে ওঠেনি।

মিরিক ছাড়িয়ে আমরা সোজা চললাম তাবাকোশির দিকে। মিরিক ছাড়ালেই উঁচু উঁচু পাইন গাছের সারি। কোথাও মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসছে। দু পাশে ঢেউ খেলানো চা–বাগান। প্রতিটি রাস্তার বাঁক যেন একেকটা ভিউ পয়েন্ট। অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডানদিকে একটা ঢালু রাস্তা নেমে গেছে। দু পাশে শুধু চায়ের সাম্রাজ্য। এই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া আরও বেশি রোমাঞ্চকর। কিন্তু তখন তো ঠিকানায় পৌঁছতে হবে। তাছাড়া গাড়িতে ব্যাগপত্তর কম ছিল না। তাই হাঁটার রোমান্টিকতা মুলতুবি রেখে গাড়িতেই বাকি পথটা পাড়ি দিতে হল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর একটা পাহাড়ি নদী। সেই নদী না হয় পেরোলাম, এবার দুদিকে দুটো রাস্তা বেঁকে গেছে। একটা বাঁদিকে, একটা ডানদিকে। কোনদিকে যাব? চালক মশাইও বেশ বিভ্রান্ত। এদিকে, জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। কারণ, ধারেপাশে কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। হোম স্টের মালিককে ফোন করে ডানদিকের

রাস্তাই নিলাম। গাড়িটা এসে থামল টি ভিলেজ হোম স্টে—তে। আগামী দুদিন এটাই আমাদের ঠিকানা। বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন বিজয় সুব্বা। হোম স্টে তে ঢোকার আগেই একের পর এক চমক। একেবারেই লাগোয়া চা বাগান। যে ঘরে থাকার ব্যবস্থা, তার জানালা খুললেই চা–বাগান। অন্য সময় কিছুটা রুক্ষ মনে হবে। কিন্তু বর্ষায় তার চেহারাই আলাদা। বাড়ির লাগোয়া দারুণ এক বাগান। ফুল কপি থেকে মটরশুটি, পেলে থেকে কলা, বাঁধা কপি থেকে মুলো, সসা থেকে টমাটো। কী নেই সেই ছোট্ট বাগানে। পরিচর্যার ছাপ স্পষ্ট। পাশেই একটা ছোট্ট চৌবাচ্চার মতো জলাশয়। সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে রঙ বেরঙের মাছ। দুপুরে খাওয়ারের মেনুও জিভে জল আনার মতোই। এমনিতে পাহাড়ের হোম স্টেতে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। দিনে ডিম, রাতে চিকেন। কিন্তু বাঙালি গেস্ট দেখে বিজয়জি আগাম মাছের বন্দোবস্ত রেখে-ছিলেন। মাছে ভাতে বাঙালির জন্য মাছের অন্যরকম আয়োজন। তার কী নাম, জানা নেই। তবে খেতে বেশ। এমনিতে ভাত, ডাল, নানারকমের সবজি, চাটনি, পাপড়, বিচিত্র স্যালাড — এসব তো ছিলই। সবমিলিয়ে অন্য সময় যা খাওয়া হয়, তার থেকে অনেক বেশিই খাওয়া হয়ে গেল।

যতই আসার ক্লান্তি থাকুক। দুপুরে গড়িয়ে নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। কারণ,

পাহাড়ে সন্ধের পর তেমন কিছুই করার থাকে না। তাই যেটুকু ঘোরার, এই দুপুরেই ঘুরে নিতে হবে। বিজয়জির বাগানে একটা কমলালেবুর গাছ দেখে কৌতূহল হল। তিনি বললেন, একটা গাছ দেখেই এত এক্সাইটেড হচ্ছেন। সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেলে হাজার হাজার গাছ দেখতে পাবেন। বোকা বোকা প্রশ্নটা করেই ফেললাম, লেবু পাওয়া যাবে? উনি হেঁসে বললেন, হাজার হাজার গাছ মানে লক্ষ লক্ষ লেবু। আমাদের রোমাঞ্চ তখন দেখে কে! ওই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে বিজয়জির এক আত্মীয়। তিনিই আমাদের গ্রাম ঘোরাতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, বিজয়জি একটুও বাড়িয়ে বলেননি। সত্যিই, একেকটা ঘরে লেবু গাছের মিছিল। কিন্তু লোকের ঘরে ঢুকে লেবু পাড়া কি ঠিক হবে? এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই একের পর এক বাড়ি, একের পর এক বাগান পেরিয়ে গেলাম। শেষমেষ লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে একটা ঘরে ঢুকেই পড়লাম। মৃদু হেসে বললাম, আপনাদের লেবু বাগানে গিয়ে দু একটা লেবু নিতে পারি? তাঁরা পাল্টা হাসি উপহার দিয়ে বললেন, আপনারা আমাদের গ্রামের অতিথি। একটা দুটো কেন, যত খুশি পাড়ুন।

সেই আশ্বাস পেয়েই চলে এলাম বাগানের দিকে। সাইজ একটু ছোট। কিন্তু হাজার হাজার লেবু ধরে আছে গাছে। গাছের গায়ে হেলান দেওয়া সিঁড়ি কাঠ যেমন আছে, তেমনি একজন এগিয়ে দিলেন আঁকশি। অর্থাৎ, ইচ্ছমতো পেড়ে নিন। একের পর এক লেবু পাড়ার পর্ব চলল। যখন ফিরে আসছি, তখন দেখি আমাদের জন্য তাঁরা চা বানিয়ে রেখেছেন। উঠোনেই চেয়ার পেতে দিলেন। এমন আতিথেয়তা সত্যিই মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। তখনও আরও চমক বাকি ছিল। বেরিয়ে আসার মুখে একজন ধরিয়ে দিলেন একটা থলি। সেখানে কেজি খানেক লেবু তো আছেই। মানি ব্যাগ বের করতে যাব, অমনি একজন নমস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, প্লিজ এটার দাম দেবেন না। এটা আমাদের ছোট্ট উপহার। আপনারা আমাদের গ্রামে ঘুরতে এসেছেন। এই লেবুগুলো তারই মেমেন্টো।

একরাশ কৃতজ্ঞতা আর মুগ্ধতা নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। দু পাশে ঘন চা বাগান মোড়া সেই রাস্তায় একটু একটু করে বিকেল নামছে।

কীভাবে যাবেন?

এনজেপিতে নেমে সরাসরি গাড়ি নিতে পারেন। খরচ কমাতে চাইলে শেয়ারে মিরিক এসে, সেখান থেকেও গাড়ি নিতে পারেন।

কোথায় থাকবেন?

বেশ কয়েকটা হোম স্টে আছে। সবগুলোই ভাল। তবে আমরা ছিলাম টি ভিলেজ হোম স্টেতে। ফোন— ৯৪৩৪১৩১৭৩৭

বেঙ্গল টাইমস

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অমর
একুশে
ফেব্রুয়ারী

- ☐ আ মরি বাংলা ভাষা
- ☐ যত দায় বুদ্ধিজীবীদের!
- ☐ মাধ্যমিকের পরে
- ☐ নীল সাহেবের কুঠি

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in